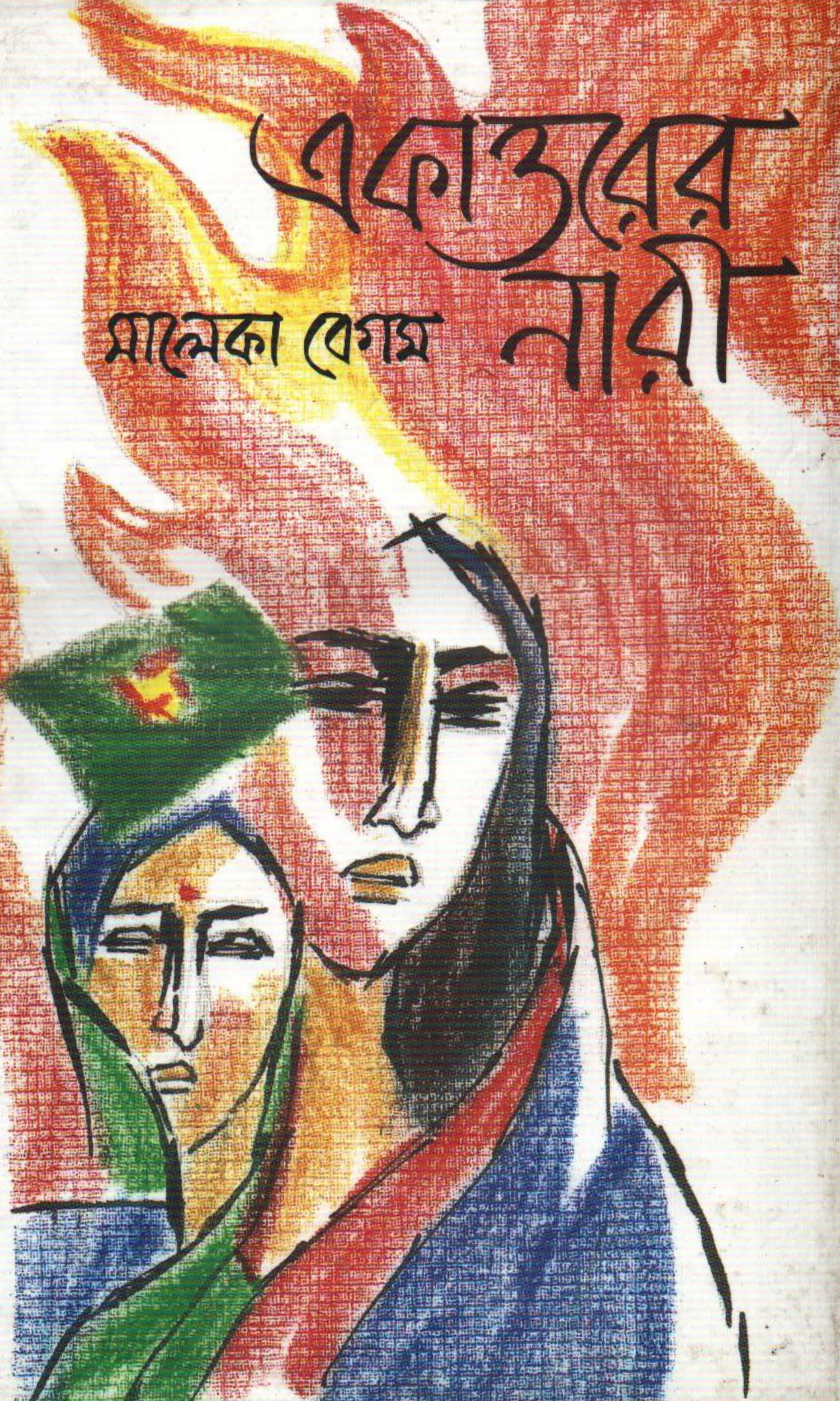
একাত্তরের নারী

মালেকা বেগম



একাত্তরের নারী মালেকা বেগম

দিব্যপ্রকাশ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ইতিহাস নানাভাবে লেখা হয়েছে। একথা সত্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা সর্বাঙ্গীন ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি।

বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং সেই প্রেক্ষাপটেই লিখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ও অবদানের ইতিহাস সবেমাত্র শুরু হয়েছে। নারী আন্দোলন উন্নয়নের সংগঠক, নারীর মানবাধিকার বিষয়ে সংগ্রামরত সংগঠক, লেখক সাহিত্যিক এই ইতিহাস লিখেছেন, উপন্যাস-গল্প লিখেছেন। সরকারের এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে প্রথমবারের মত বলা হয়েছে ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রাখে। একাত্তরের নারীকে আমাদের দেখতে হবে, জানতে হবে আন্তরিক দৃষ্টিতে। এরই আলোকে লেখক বইটির নয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করেছেন।

মালেকা বেগম (জ. ১৯৪৪) বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নারী নেত্রী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স (১৯৬৫), এম এ (১৯৬৬) এবং সমাজবিজ্ঞানে এম এ (১৯৬৮) ডিগ্রী অর্জন করেন। এম ফিল, ১ম পর্ব (১৯৯৩) শেষে 'যৌতুক বাংলা সাহিত্য ও সমাজে প্রতিফলন' বিষয়ে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদিকা হিসাবে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ২২ বছর। নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি বেইজিং বিশ্বনারী সম্মেলনের (১৯৯৫) পূর্বে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নারীর উন্নয়ন, সমতা ও শান্তির লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগের গেস্ট লেকচারার।

মালেকা বেগম লিখছেন ষাটের দশক থেকে। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ১৯। নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনের কাজে সফর করেছেন ১২টি দেশ। নানা জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ে পাক্ষিক সচিত্র সন্ধানী ও পাক্ষিক প্রকৃতি-র নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

একাত্তরের নারী : রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি
মালেকা বেগম

©
লেখক

প্রকাশক
মঈনুল আহসান সাবের
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১২১৫৭৪
প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ
সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার, ঢাকা
মূল্য : ১০০ টাকা

EKATTORER NARI : RASHTRA, SHAMAJ, RAJNITI : By Maleka Begum. First Dibyaprakash edition February 2004. Cover Designe by Qayyum Chowdhury. Price Taka 100.

ISBN 984 483 177 7

উৎসর্গ

মুষ্টিমেয় হলেও পুরুষ সমাজের যাঁরা
একাত্তরের নারী সমাজকে
সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেছেন
তাঁদের হাতে

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

প্রথম সংস্করণে লেখকের কথা

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু গবেষক, সাহিত্যিক, সহযোদ্ধা-সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতা, পরামর্শ ও মতামত পেয়ে গবেষণা কাজটি সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন আমার পরম শুভানুধ্যায়ীদের অন্যতম। তিনিই প্রথম আমাকে উজ্জীবিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ে গবেষণা করার জন্য, বই লেখার জন্য। তার উৎসাহে ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন-এর সক্রিয় সহযোগিতায় এই গবেষণা কাজটি বাস্তবায়িত হলো। সেজন্য দুজনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাত্ত্বিক কাঠামো বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদা ইসলামের কাছে। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সদয় অনুমোদনের ফলে এই গবেষণা কাজের আর্থিক সহায়তা পেয়েছি। সেজন্য তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণা বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে আলোচক ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও বাংলা একাডেমির পরিচালক কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, সভাপতি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর বোর্ড অব গভর্নর-এর সদস্য অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ। তাঁদের মূল্যবান মতামত, নির্দেশনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো বিষয়ে পরামর্শ আমার গবেষণা কাজের সমৃদ্ধি এনেছে। সেজন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেমিনারের আয়োজনে সহায়তা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপ-অধিকর্তা (গবেষণা) মোহাম্মদ সেলিম ও উপঅধিকর্তা একাডেমিক রফিকুল আকবর এবং বইটি প্রকাশ করেছেন আহমেদ মাহমুদুল হক। তাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, নারী প্রগতি সংঘের গ্রন্থাগার, দৈনিক প্রথম আলোর গ্রন্থাগার বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দের সহযোগিতায় গবেষণার প্রয়োজনীয় মূল তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাদের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এই পাণ্ডুলিপির প্রতিটি লাইন পড়ে সংযোজন, সংশোধনের জন্য মূল্যবান মতামত দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পারিবারিক পরিমণ্ডলে গবেষণায় সাহায্য করেছেন দৈনিক *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান। মেয়ে মোহসিনা বেগম ও ছেলে মাহমুদুর রহমানের সহযোগিতা পেয়ে আমি ধন্য।

এই বইটি পাঠক-সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

মালেকা বেগম
১৫.০১.২০০১

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের কথা

গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। পাঠকের চাহিদা থাকায় এবং বইটির দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণে দিব্যপ্রকাশ আগ্রহ প্রকাশ করায় প্রথম সংস্করণের কিছুটা বর্ধিত ও সংশোধিত প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। প্রকাশক মঈনুল আহসান সাবেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথম সংস্করণের বই আমার সংগ্রহে না থাকায় পুনর্মুদ্রণের জন্য নিজের বইটি দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন পরম স্নেহের তরুণ গবেষক-লেখক হাসিনা আহমেদ।

বইটি পুনরায় পাঠক সমাদৃত হলে সকলের শ্রম সার্থক হবে।

মালেকা বেগম
১৫ লারমিনি স্ট্রিট
ওয়ারি, ঢাকা ১২০৩

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
Bangladesh Liberation War Library & Research Centre
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ইতিহাস নানাভাবে লেখা হয়েছে। শুনতে নয় মাস স্বল্পকালীন মনে হলেও এর প্রেক্ষাপট বিপুল কালব্যাপী বিস্তৃত। যুদ্ধ বলতে যত কিছু সামরিক কর্মকাণ্ড, সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত বাহিনীর শৌর্যবীর্য, আত্মোৎসর্গ, এসবই আমরা বুঝি। জনসাধারণ যখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করেন তখন তাদের সামরিক যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ ছিল না। এদেশের বাঙালি পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং রাইফেল্‌স্ বাহিনী বা ইস্টপাকিস্তান রাইফেল্‌স্ (ইপিআর)-এর প্রশিক্ষিত সৈনিক যোদ্ধারা প্রতিরোধ শুরু করেন প্রাথমিকভাবে এবং তাদের সাথে যোগ দেন এদেশের জনগণ। তবে কোন গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলনা বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।[১]

মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ইতিহাস এতটাই ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিস্তৃত যে, জনগণ-রাজনৈতিক দল-ব্যক্তি, বেসামরিক-আধা সামরিক-সামরিক বাহিনী, বুদ্ধিজীবী-গবেষক, ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক-জনতা, নারীসমাজ সকলেরই মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ ও ভূমিকার নিদর্শন রয়ে গেছে। একথা সত্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং সেই প্রেক্ষাপটেই লিখেছেন। সাধারণ মানুষ, নারী-পুরুষ জনগণের একটা ব্যাপক অংশ দেশের ভিতরে সংগ্রাম করে, আত্মত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু তাদের কথা আজও অকথিত রয়ে গেছে।[২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ও অবদানের ইতিহাস সবেমাত্র লেখা শুরু হয়েছে। নারী আন্দোলন-উন্নয়নের সংগঠক, নারীর মানবাধিকার বিষয়ে সংগ্রামরত সংগঠক, লেখক-সাহিত্যিক এই ইতিহাস লিখছেন, উপন্যাস-গল্প লিখেছেন। সরকারের এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে প্রথমবারের মতো বলা হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রাখে।[৩]

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নারীর পরিচয় জানা ছিল না। যুদ্ধের সময় নারী ধর্ষিত হয়েছে, পুনর্বাসন দরকার স্বামীহারা বিধবা ও ধর্ষিতাদের এটাই বড় করে দেখা হয়েছিল। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নারীদের পারিবারিকভাবে স্বীকৃতি দিতে ও গ্রহণ করতে

সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ১৯৭১-এর নারী নির্যাতনকে রাষ্ট্র বীরত্বের মহিমা দিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছিল। নির্যাতিত নারীদের গর্ভপাত করাবার পদক্ষেপ সরকার নিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে, বিজয় লাভের ঠিক পরপর।[৪]

অস্ট্রেলিয়ার শল্য চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশে এসেছিলেন। একাত্তরের নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তখন দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দু'টি পুনর্বাসন সংস্থার কাজ চলছিল। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পরিচালক মালেকা খান ও প্রধান উদ্যোক্তা ফিরোজা খাতুনসহ অনেক মহিলা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর পর পরই পাকবাহিনী ও রাজাকারদের দ্বারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মেয়েদের বিভিন্ন বন্দী শিবির ও বাংকার থেকে উদ্ধার করতে থাকেন। ওদের নিয়েই গড়ে ওঠে আবাসিক নারী পুনর্বাসন সংস্থার কাজ।[৫]

একাত্তরের নারীকে আমাদের দেখতে হবে, জানতে হবে আন্তরিক দৃষ্টিতে। প্রথমত বুঝতে হবে যে, ব্যাপক নারী নিগৃহীত হয়েছে যুদ্ধের সময়ে দেশের সর্বত্র—শুধুমাত্র নারী হিসেবেই। এও এক ধরনের যুদ্ধ করেছে নারীরা, তার শরীরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ—সেটা বুঝতে সময় লেগেছে আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সকলের। নারী মুক্তিযুদ্ধে যোদ্ধার মতই আত্মত্যাগ করেছে সেটা বুঝতেও সময় লেগেছে সকলের।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক সামরিক জান্তার গণহত্যার কথা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ নেই। সংবিধানের প্রস্তাবনায় (১৯৭২) বলা হয়েছে আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যেসকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;'[৬]

গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের কথা নেই সংবিধানে। নেই নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। এসব বিষয়ে ২০০০ সালে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত' [International Criminal Court (ICC)] বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ, দলিলে স্বাক্ষর প্রদান ও অনুমোদন করার প্রক্রিয়া চলার সূত্রে। গণহত্যা ও নারীধর্ষণ যুদ্ধকালীন অপরাধের বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এইক্ষেত্রে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত দল, ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের, নেতা-নেত্রীদের কোন সচেতন উদ্যোগ নেই বললেই চলে। ICC-র কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত আইনজীবী ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।[৭]

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ও অবদান বিষয়ে রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৭২ সাল থেকেই শুরু করেছে এবং এখনও করছে।[৮]

১৯৮৭ সালে *উইমেন ফর উইমেন* সমাজের কাছে একাত্তরের নারীর পরিচয়ের বিষয়টি তুলে ধরেছে 'একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ' হিসেবে।[৯]

১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে *নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা* আয়োজিত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ১. মা বোন স্ত্রী মেয়েদের শুধু শোকার্ত হিসেবে দেখা হয় কেন? ২. মুক্তিযুদ্ধ কেন শুধু সৈনিকের ব্যাপার হয়ে উঠেছে? ২. বন্দুক হাতে না নিলে মুক্তিযোদ্ধা হয় না, সীমান্তের ওপারে না গেলে মুক্তিযোদ্ধা হয় না—এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে কেন? ৪. স্বামী সন্তান যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে বলে মা ও স্ত্রীকে গৌরবান্বিত করা হয়, কেন তার নিজের অবদানকে দেখা হয় না?[৯]

১৯৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী (২৫ বছর পূর্তি) পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান বিষয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য বৃত্তির সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুদান বা বৃত্তির আবেদনপত্রে অভিভাবক হিসেবে 'মায়ের নাম' যুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আইন সংশোধন না হওয়ায় সমস্যা হবে বলে আইন বিশেষজ্ঞরা ও নারী-মানবাধিকার সংগঠকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুসারে সম্প্রতি ২০০০ সালে সরকারিভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে বাবার ও মায়ের নাম সব ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে। এই বিষয়ক আইন প্রণয়ন ও গেজেট হয়েছে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

'সিডও সনদ' বা 'নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ'-এর (আন্তর্জাতিক) সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মায়ের সমঅধিকারবিষয়ক ধারার প্রতি বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি সম্মতি দিয়েছেন। সেই অনুসারে বাংলাদেশের অভিভাবকত্ব আইনের সংশোধন করা না হলে এই আইন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে না।

মানবাধিকার সংস্থাসমূহের, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এবং সকল নারী আন্দোলন সংগঠনের দাবি রয়েছে : 'গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের জন্য পাকিস্তানী সেনাদের, যুদ্ধ অপরাধী এদেশের আলবদর-রাজাকারদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।'[১০] কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার এই দাবি অনুসারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

বাংলাদেশের গবেষক আয়শা বানু ১৯৯৪ সালে তাঁর গবেষণা কর্মে প্রশ্ন তুলেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের বা স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় যখন দেদীপ্যমান তখন বাঙালি নারী (জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ) তার কি পরিচয় পেল? সে কি ইজ্জত-সম্ভ্রম হারানোর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 'বীরাঙ্গনা' উপাধি পেল রাষ্ট্র থেকে? যারা মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের মত, মানুষের মত, অংশ নিতে চেয়েছেন, নিয়েছেন,

সংকট ও যুদ্ধ মোকাবিলা করেছেন তারা সত্তার পরিচয় জেনেছেন কি? পেয়েছেন কি মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি?[১১]

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান বিষয়ে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'যুদ্ধ' উপন্যাসে তিনি নতুন দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত-নির্যাতিত নারীর পরিচয় তুলে ধরেছেন, একাত্তরের নারীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি চরিত্রের সংলাপে বলেছেন :

—'যুদ্ধ? মাখন বিষণ্ন দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে তাকায়।

—কি ভাবছ? পায়ের কথা?

—যুদ্ধে আমি পা হারালাম।

—তাতে কি হয়েছে? যুদ্ধ এমনই। মেয়েরাতো যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েও অঙ্গ হারায়।

—কিভাবে?

—ধর্ষিত হলে ওদের গর্ভ হয়। সেটা মাতৃত্বের গর্ভ না। সেটা জরায়ুর জখম।

বেনু বলে, ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমহি দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তোমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন পর হামারও জরায়ুর ঘা শুকায়ে যাবে। স্বাধীনতা কি সোজা কথা? স্বাধীনতা কত কিছু নেয়। হের লাইগে মন খারাপ করবো ক্যান হে?'[১২]

এই উপন্যাসে কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন একাত্তরের নির্যাতিত নারীকে 'যুদ্ধাহত' বলে সমাজের বন্ধ দৃষ্টিকে খুলে দিয়েছেন।

বীর প্রতীক তারামন বেগমের নাম ছাপা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটে। কিন্তু তারামন বেগমকে রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কেউই খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেন নি। বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি অনেকের কাছেই যে, একজন নারী স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র সৈনিকের মত লড়াই করতে পারেন। এই মুক্তিযোদ্ধাকে সনাক্ত করার দুরূহ কাজটি করেছেন গবেষক-অধ্যাপক-সাংবাদিক বিমল কান্তি দে। ১৯৮৭ সালে শুরু হয় তাঁর উদ্যোগ।

তিনি সফল হয়েছেন ১৯৯৫ সালে। অনেক পদক প্রাপ্ত বীরের অন্যতম তারামন বেগমের বাবার নাম, ঠিকানা, বাংলাদেশ গেজেটে ছিলনা। সেসময় দু'জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছিলেন। ডাক্তার সেতারা বেগম ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালে আর্মি মেডিকেল কোরের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তারামন বেগম দেশের ভিতরে ছিলেন, কোদাল কাঠি রাজীবপুর, তারাবর সাজাট গাইবান্ধা অঞ্চলে কমপক্ষে তিনটি যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছেন। সাধারণ পরিবারের কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণী মেয়েটির খোঁজ যখন পাওয়া গেল তখন তিনি রুগ্ন, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, দরিদ্র এক প্রৌঢ় নারী। *দৈনিক ভোরের কাগজ* পত্রিকার উদ্যোগে তখন তারামন-তহবিল গড়ে তোলা হয়। নারীসমাজ সম্মিলিতভাবে তারামন বেগমের সংবর্ধনার আয়োজন করে।[১৪]

১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ নারীপ্রগতি সংঘ থেকে জানা গেল মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবির কথা। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের

মেয়ে কাঁকন বিবি। খাসিয়া এই মহিলা 'মুক্তিযোদ্ধা বেটি' নামে এলাকায় পরিচিত। ২০টি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন তিনি। নারীপ্রগতি সংঘ তাঁর জন্য তহবিল গড়ে মাসে ১০০০ টাকা করে সম্মানী দিচ্ছে।[১৫]

ক্রমশই জানা যাচ্ছে মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নাম। করফুলি বেওয়া, পিয়ার চাঁদ, সৈয়দা জিনাত আরা বেগম, বীথিকা বিশ্বাস প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানা যাচ্ছে এখন।[১৬]

একুশ শতক আমাদের জন্য বহু রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দিচ্ছে; নারীমুক্তির রুদ্ধ অনেকগুলো ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করছে নতুন শতক। যা সত্য তা বেরিয়ে আসবেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী জনগণের অর্ধাংশ হিসেবেই সমাজে, পরিবারে, দেশে, শরণার্থী শিবিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে, বাংকারে, বন্দীশিবিরে উপস্থিত ছিল। স্বদেশ প্রেম, আত্মপ্রেম, বাঁচার প্রয়াস, সাংগঠনিক সুযোগ, নিজস্ব কর্মকুশলতা, যোগ্যতা—এসব কিছুই একাত্তরের নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা রূপে। একাত্তরের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালে নারীর সংগ্রাম বুঝতে হলে সে সময়ের রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটও বুঝতে হবে। যুগ-যুগ ধরে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ গড়ে তুলেছে তা রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। সমাজের অপ-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। নারী এবং পুরুষ উভয়ই এই সমাজের মানুষ। নারীর প্রতি অপ-দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ যখন গড়ে তুলতে থাকে তখন তা বাসা বাঁধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে। রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এই জনগণের প্রতিনিধিরাই নিয়ন্ত্রণ করেন ও পরিচালনা করেন। সমাজ বিকাশের স্তরে পুরুষের এগিয়ে যাওয়া যেমন রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি নারীর পিছিয়ে যাওয়াও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই কাজটি নারী তার অজান্তেই করে গেছে সামাজিকীকরণের শিকার হয়ে। এক সময় লক্ষ্য করা গেল যে, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। এর বিরুদ্ধে শুরুও হলো নারী আন্দোলন।

একাত্তরের নারীর আত্মপ্রকাশের পটভূমি এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

নারীর কতটুকু করা ও পারা উচিত, কোন পরিস্থিতিতে নারী কী ভূমিকা নেবে এসবই সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির ধারক বাহকরা ঠিক করে গণ্ডি টেনে দিতে চেয়েছেন অতীত থেকে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত। বলাবাহুল্য এই ধারক বাহকরা পিতৃতান্ত্রিক ভাবধারায় লালিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। এই সমাজকাঠামোর মধ্যে নারীও পিতৃতান্ত্রিক ভাবধারায় লালিত হয়।

সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে নারীর নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের কথা সমাজের ব্যাপক নারী ও পুরুষ বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস উপেক্ষাকারী, নাকচকারী বা প্রতিবাদী নারী-পুরুষের সংখ্যাও অনেক।

ইতিহাসের কোন কোন অমোঘ সময়ে নারীর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দিষ্ট বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান জানান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মহৎ ব্যক্তিত্ব ও নেতাদের কেউ কেউ। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ব্রিটিশ বিরোধী, স্বদেশী

ও স্বাধীনতা আন্দোলনে পরাধীন ভারতবর্ষের, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ব্যাপক নারীসমাজ অভূতপূর্ব ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছিলেন।

সমাজের কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, শিক্ষাহীনতা, পরনির্ভরতা, বৈষম্য, শোষণ ও অবরোধ মোচনের সংগ্রামে নারীসমাজকে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন যথাক্রমে

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), আবুল হুসেন (১৮৮৭-১৯৪৮), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৮৮৮-), আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬), লীলা নাগ (রায়) (১৯০০-১৯৭০), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২), ইলামিত্র (জ. ১৯২৫-২০০২) প্রমুখ।

এঁদের কর্মকাণ্ডে নারী জাগরণের ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

পরবর্তীকালে শামসুন্নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, দৌলতুন্নেসা খাতুন এবং আরো বহুজন নারী শিক্ষা, নারীর আইনি অধিকার, নারী সচেতনতা ও নারীর মানবাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এসবই ইতিহাসের অমোঘ সময়ে নির্দিষ্ট ভূমিকার বাইরে উত্তরণের জন্য নারীসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মহতী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহ্বান জানিয়েছেন জনগণকে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ একাত্তরের নারীসমাজ যেভাবে অক্ষরে অক্ষরে মেনেছে সে কাহিনী এখনো রয়ে গেছে সম্পূর্ণ অজানা।

স্বদেশী আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, তে-ভাগা আন্দোলন, পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ—প্রতিটি ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে এদেশের নারীসমাজ চিরাচরিত ঐতিহ্যিক ও নির্দিষ্ট ভূমিকার বাইরে নতুন নতুন বিপ্লবী সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধার দায়িত্ব পালন করেছে। নারীসমাজের এই ভূমিকা এবং অবদান ইতিহাসে অকথিত ও প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ হয়ে আছে আজও।

নারীসমাজের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় ইদানীং আবিষ্কৃত হচ্ছে। 'প্রত্নতত্ত্ব' 'পুরাতত্ত্ব' আবিষ্কারের ঘটনায় যেমন বিস্ময় জাগে, সন্দিহান হই খাঁটিত্ব বা সঠিকত্ব নিরূপণে, তেমনি সবিস্ময়ে ও সন্দেহ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা এই নারীর আবির্ভাবকে যাচাই করতে চাই আমরা অনেকেই। অথচ নতুন নতুন ব্যক্তিপুরুষের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়কে যাচাই করে দেখার প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না। কেননা পুরুষের এ ধরনের ভূমিকা যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি কয়েকশত বছর ব্যাপী বিস্তৃত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, স্বাধীনতার বিজয়ে, নারী জনগোষ্ঠীর অবদান পুরুষের তুলনায় কম নয় বরং সমকৃতিত্বেরই পরিচায়ক—সেটা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত

সত্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ধাপেই সৃজনশীল, দক্ষ, বীর, যোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে নারীর অবদান তথ্য সমৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও পুরুষের ভূমিকা যেমন দৃশ্যমান, তেমন নয় নারীর ভূমিকা ও অবদান। যুগ যুগ ধরে নারীকে অদৃশ্য রাখা এবং নারীর ইতিবাচক ভূমিকা ও পরিচয়কে অদৃশ্য রাখার মধ্য দিয়ে সমাজ মানস থেকে, প্রকারান্তরে ইতিহাস থেকে বিস্মৃত করে দেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

এই গ্রন্থটিতে মোট ৯টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম অবতরণিকা। এই অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও নারীসমাজের অবস্থান, রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতির দৃষ্টিতে একাত্তরের নারীর ভূমিকা—রাষ্ট্রীয় নীতি ও পদক্ষেপ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোচনায় গবেষণা কাজটির পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে অতিসংক্ষিপ্ত একটি তত্ত্বগত আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে (উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান) সংগঠক ও অংশগ্রহণকারী নারীসমাজ এবং বৃহত্তর নারীসমাজের সামগ্রিক অবস্থানের কথা। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার অকথিত ইতিহাস নিয়েই এই অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নারীর প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি কি মনোভাব গ্রহণ করেছিল সেই কথা। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা যোদ্ধা রূপে নারীর ভূমিকার কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক নারীদের কথা। বাংলাদেশে, ভারতে ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের নাগরিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারক, সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাদের মধ্যে নারীরাও ছিলেন সক্রিয় সংগঠক। সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার মায়ের কথা। অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে নারী নির্যাতনের সশস্ত্র-সংঘাতময় পাশবিক ঘটনার প্রেক্ষিতে একাত্তরের নারীর অবস্থান। নবম অধ্যায়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী একাত্তরের নারীর কথা।

বইয়ের পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে অধ্যায় ভিত্তিক তথ্যসূত্র, প্রয়োজনীয় দলিল ও বইয়ের তালিকা।

বর্তমান গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে প্রকাশিত গ্রন্থ, সংবাদপত্রের সংবাদ, সংবাদপত্রে ও প্রকাশিত গ্রন্থে সংযুক্ত সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

বহু বই হয়তো পড়া সম্ভব হয়নি, পাইনি সংগ্রহে। সেজন্য অনেকের অবদান হয়তো উল্লেখ করা হয়নি। নিজগুণে তারা ক্ষমা করবেন এই আমার নিবেদন। তথ্য পেলে পরবর্তীতে সংযোজন করা হবে।

সরাসরি কোন সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থের জন্য গৃহীত হয়নি। কোন মাঠ-জরিপ কাজও করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে, মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরবর্তীকালে নিজে (গ্রন্থকার) সরাসরি যুক্ত থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার ভিত্তিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনে পূর্বে গৃহীত কোন কোন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বইটির কোন কোন অধ্যায় রচিত হয়েছে। সেজন্য বলা যায় পরোক্ষ সূত্র থেকে গৃহীত তথ্য প্রয়োগ করে এই বইটি রচিত হয়েছে। ইতিহাসের সত্য তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

সূত্র

১. সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস্ ও অন্যান্য বাহিনী,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ১৭।

২. মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া, *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা,* ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ১৯৯৯। পৃ. লেখকের কথা ১।

৩. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৯৭।
উদ্ধৃতি '১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের ২ লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবিধিকার লংঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়।'

৪. শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি,* ঢাকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৯, পৃ. ১৩।
উদ্ধৃতি 'মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ সরকার নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবেও এঁদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এঁদের বীরাঙ্গনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।'

৫. সুমনা শারমিন ও মুন্নী সাহা, 'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা', ঢাকা, *সাপ্তাহিক কাগজ*, ১৯৯২, মে মাস, পৃ. ১২।

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, *বাংলাদেশ গেজেট,* অতিরিক্ত সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১০।

৭. Faustina Pereira, 'The International Ciminal Court and implementation Mechanisms,' Bangladesh Journal of law (Vol. 3 No. 1), Dhaka, 2001.

৮. *সাধারণ সম্পাদিকার (কেন্দ্রীয় কমিটি) রিপোর্ট,* ঢাকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জাতীয় সম্মেলন (১৯৭২ থেকে ২০০০)।

৯. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা (সম্পাদিত) *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ,* ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪

১০. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), ঢাকা, *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা,* ঢাকা, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯১।

১১. শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৬।

১২. Ayesha Banu, *Mere Pawns or growing Power; Construction of National Identity in gender Identity in Bangladesh,* London, Sussex University, 1994.

১৩. সেলিনা হোসেন, *যুদ্ধ,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০ পৃ. ২৮৮-২৯১।

১৪. *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

১৫. রেহানা পারভিন রুমা, মুক্তিযুদ্ধে নারী, ঢাকা, দৈনিক *জনকণ্ঠ,* ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮।

১৬. ঐ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তত্ত্বগত কাঠামো

একাত্তরের নারীর প্রকৃত পরিচয় ইতিহাসের বিস্মৃতি থেকে ও অদৃশ্য অবস্থান থেকে উদ্ধার করে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। শুধুমাত্র নারীর ইতিহাস রচনাই এই গবেষণার লক্ষ্য নয়। নারীর ভূমিকা কিভাবে ইতিহাস লেখার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, কিভাবে অস্বীকার করা হয় নারীকে সশস্ত্র সংগ্রামের যোদ্ধা হিসেবে, কিভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে নারী শুধু ধর্ষিতা পরিচয়েই সমাজ ও পরিবার কর্তৃক অস্বীকৃত-অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি একাত্তরের নারীকে কিভাবে ইতিহাসের সত্য অবস্থান থেকে বিস্মৃতির অন্ধকারে সরিয়ে দিয়েছে—সেসব অনুসন্ধান করাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে বৈষম্যগত দৃষ্টিভঙ্গী। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতেও সেই একই প্রভাব রয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি ঠিক করে দেয় নারী কি ভূমিকা পালন করবে। নারী সেই সীমা ও গণ্ডী ছাড়িয়ে উত্তরোত্তর নতুন-নতুন ভূমিকা পালন করলেও তা স্বীকার করা হয় না। এই প্রেক্ষাপটে একাত্তরের নারীর ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিককালে নারীর সংগ্রামকে তুলে ধরার লক্ষ্যে নানাবিধ নারীবাদী ইতিহাস রচনার তথ্য পাওয়া যায়। উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাংলার নবজাগরণের অগ্রনায়করা নারী জাগরণের ইতিহাস তৈরি করেছেন। বাঙালি নারীর জাগরণের ইতিহাস তৈরির জন্য বিশ শতকের নেত্রীদের মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম স্মরণীয়।[১]

বাংলাদেশের সংগ্রামী নারীদের জীবনালেখ্য তুলে ধরা হয়েছে নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ রচিত *মুক্তিমঞ্চে নারী* এবং বাংলাদেশ নারীপ্রগতি সংঘ থেকে প্রকাশিত *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* বইয়ে।[২]

উইমেন ফর উইমেন, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলা একাডেমি, আগামী প্রকাশনী, ইউপিএল, সাহিত্য প্রকাশসহ বহু প্রকাশনী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বই প্রকাশ করছে।

নারীর জীবনালেখ্য নিয়ে বই ও লেখালেখি নারীকে দৃশ্যমান করে।

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত *কথা ইতিহাসের রূপরেখা*-য় মুক্তিযোদ্ধা নারী-পুরুষ উভয়ের সাক্ষাৎকার রয়েছে।[৩]

র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস বা তল থেকে দেখা ইতিহাস রচিত হয়েছিল সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে। এই ইতিহাস রচয়িতারা অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজ মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ক্রিস্টোফার হল, এডওয়ার্ড টমসন, এরিক ইবসবম-কে। এর ফলে ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা, ব্যক্তির অবদান খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তবু দেখা গেছে এসব ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি ও ঘটনাই প্রাধান্য পায়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা যায় নারীর সত্য অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে।[৪]

জোন কেলি তাঁর 'The Social relation of the Sexes Methodological Implications of 'Women's History' প্রবন্ধে নারীর ইতিহাস রচনার তত্ত্বগত কাঠামো নিয়ে গভীর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন "নারীর ইতিহাস (Women's History) প্রত্যয়টির দু'টো লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যথা

- ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় নারীকে নিয়ে আসা।
- আমাদের ইতিহাস রচনাকে নারীর কাছে নিয়ে যাওয়া।

ঐতিহাসিক চিন্তার তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি প্রশ্ন তুলেছে এই 'নারীর ইতিহাস'

—ঐতিহাসিক কাল বিভাগ (Periodization)

—সামাজিক বিশ্লেষণের পর্ব (The Catagories of Social Analysis)

—সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theoires of Social Change)।"[৫]

এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণ করে *একাত্তরের নারী রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি* বইটি রচিত হয়েছে।

সমাজের অর্ধাংশ নারী এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থান সামাজিক বিষয়। কিন্তু যখন আমরা আর্থ-সামাজিক, সাংবিধানিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পাঠ নিতে যাই, সে সময় দেখি নারীকে পূর্ণ নাগরিক ও সমাজের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। নারী অদৃশ্য সেই ইতিহাস থেকে।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ব হিসেবে জোন কেলি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই সত্যটি যে. 'বিভিন্ন সময়কাল অথবা বিরাটাকারের সামাজিক পরিবর্তন সাধনকারী আন্দোলনগুলোকে দেখতে হবে নারীর স্বাধীনতা ও নিপীড়নের আলোকে. নারীর মানবতার অগ্রগতি ঘটানোর জন্য সেই সাথে পুরুষের জন্যও সেই সকল কাজ ও আন্দোলন কি বয়ে এনেছে তার আলোকে। যে মুহূর্তে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে—যে মুহূর্তে মানুষ উপলব্ধি করবে যে নারী সম্পূর্ণ অর্থেই মানবতার অংশ—সেই সময়কাল অথবা ঘটনাগুলো সাধারণভাবে গৃহীত সময়কাল অথবা ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এবং ভিন্ন অর্থের ধারক, বাহক।

কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালের বিরাজমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা থেকে নারী বঞ্চিত থাকার কারণে একই ঐতিহাসিক ঘটনা নারীর উপর ভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে (যা কিনা পুরুষের অগ্রগতি সাধন করেছে ঠিকই)—আমাদের তাই এই লিঙ্গীয় ভিন্নতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে।"[৬]

জোন কেলি'র তত্ত্ব দিকনির্দেশ করছে যে, নারী সাধারণভাবে সামাজিকীকরণের ফলে নিজ শ্রেণীর পুরুষের আগ্রহ ও মতাদর্শকে লালন করে, অনুসরণ করে, তা সত্ত্বেও

সামাজিক শ্রেণী হিসেবে নারী সেই অবস্থান থেকেও এগিয়ে যায়। তবু এটা ঠিক নারীর অবস্থান বিচারে নারীকে নারী হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে। যে কোন শ্রেণী, বর্ণ, সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর বিপরীত শ্রেণী বর্ণ বা গোষ্ঠী হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করলে চলবেনা। বরং নারীকে দেখতে হবে পুরুষের বিপরীতে সংখ্যাগুরু সামাজিক মানুষ হিসেবে। প্রাকৃতিক-শারীরিক বিভাজন নারীর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ও পুরুষের অধ:স্তনতা ও অধীনস্ততা তৈরি করে না। সামাজিকভাবে নির্ধারিত, গঠিত এবং সামাজিকভাবে নারীর ভূমিকা আরোপিত হয় আর সেইভাবেই নারী-পুরুষের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্কগুলো স্বীকৃত হয়।[৭]

জোন কেলি সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে বলেছেন যে, নারী ও পুরুষের ভূমিকা এবং কাজের ক্ষেত্রে ঘর-গার্হস্থ্য জগৎ এবং বাইরের জগতের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয়া হয়।[৮] এই হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। এর উত্তরণ ঘটাতে হলে সমাজ পরিবর্তনের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। সেটা রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ ও রাজনীতির যেমন কর্তব্য তেমনি ব্যক্তি নারীর নিজেরও দায়িত্ব।

উপরে আলোচিত নারীবাদী ইতিহাস রচনার তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত করা হবে।

'একাত্তরের নারী'—একটা নির্দিষ্ট সময়ের, নির্দিষ্ট সমাজ, রাজনীতি ও দেশের নারী। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে যুগ যুগ ধরে নারীর জন্য যে সমাজ কাঠামো, দৃষ্টিভঙ্গি ও লিঙ্গীয় সামাজিকীকরণ গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই 'একাত্তরের নারী' বিকাশ লাভ করেছে। একাত্তরের নারীকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা যাবে না। বাংলাদেশের সামাজিক যে প্রেক্ষাপট বিশ শতকের ষাটের দশকে ছিল তার মধ্যে নারীর বিকশিত হয়ে ওঠা ও মানুষ হিসেবে ভূমিকা পালনের কথা সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষের একটি ব্যাপক অংশ ভাবতেই পারেনি। কেউ কেউ ভেবেছে। সেটা নারীর ব্যতিক্রমী পরিচয় হিসেবে ধরা হয়েছে। এই নারী চিহ্নিত হয়েছে প্রধানত ব্যতিক্রমী হিসেবে। কিংবা বলা হয়েছে এই নারীরা 'পুরুষের মত' বা 'পুরুষের মত বুদ্ধি' সম্পন্ন। একাত্তরের নারীর বা মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিষয়ে ইতিহাস লিখনের বিস্মৃতি ও অদৃশ্য করণের অবহেলা থেকে উত্তরণের জন্য প্রথম থেকেই একাত্তরের নারীর ইতিহাস স্বীকৃত হয়েছে, ক্ষতিপূরণমূলক (compensatory) ইতিহাস হিসেবে যা যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র হিসেবেই একাত্তরের নারী ইতিহাসে স্থান পেতে পারে না।

জোন কেলি-র অনুসরণে বলা যায়, "এই ব্যতিক্রমধর্মী নারীদেরও যথার্থ স্থানে অধিষ্ঠিত করতে হবে। সেই সাথে ঐতিহাসিক চিন্তার অন্য একটি উপবিভাগ হিসেবেও একে দেখা যাবে না, অর্থাৎ কূটনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং এ জাতীয় ইতিহাসের তালিকার পাশাপাশি রাখার জন্য নারীরও একটা ইতিহাস হিসেবে দেখা যাবে না। কেননা এসকল ক্ষেত্রের বিকাশ নারীর ইতিহাসের প্রতি আঘাত হেনেছে। তাই নৃবিজ্ঞানের মত ইতিহাসের ক্ষেত্রেও 'নারীবাদী জ্ঞানচর্চার' উদ্ভব ঘটেছে যা কিনা প্রধানত নারী 'মর্যাদার' (status) ওপর দৃষ্টি দেবে।"[৯]

আলোচ্য গ্রন্থে একাত্তরের নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসেবে নয় মানবসমাজের অংশ হিসেবে, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে দৃশ্যমান ও মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

সূত্র

১. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২।

২. ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, ঢাকা, প্রিপট্রাস্ট, ১৯৯৯, এবং সেলিনা হোসেন, অজয় দাশগুপ্ত, রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ নারীপ্রগতি সংঘ, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯।

৩. প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, *কথ্য ইতিহাসের রূপরেখা*, ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ১৯৯১

৪. সায়মা খাতুন, নারীবাদী ইতিহাস রচনার সংকট, ঢাকা, *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৪ বিশেষ সংখ্যা বাংলাদেশের বহুকণ্ঠ, পৃ. ৭৩-৭৪, নভেম্বর ১৯৯৯।

৫. Joan Kelly, The Social Relation of the sexes Methodoligical Implications of Women's History 'in *Women, History and Theory. The Essays of Joan kelly'*, Chicago and London. The University of Chicago Press, 1986.
উদ্ধৃত সায়দিয়া গুলরুখ এবং মানস চৌধুরী (সম্পাদিত) *কর্তার সংসার*, ঢাকা, রূপান্তর প্রকাশনা, ২০০০, পৃ. ৭১।
(মূল লেখা অনুবাদ নায়িম সুলতানা, *সমাজ নিরীক্ষণ* ৬৮ পৃ. ১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২)

৬. জোন কেলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

৭. জোন কেলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

৮. জোন কেলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

৯. জোন কেলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার অকথিত ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু পরোক্ষভাবে চিহ্নিত হয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে। প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন থেকে। পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থার অবসানের দাবি ছিল ৬ দফা। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এই ৬ দফা দাবির প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ওপর দমননীতি শুরু করে। শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হয় ১৯৬৬ সালের ৮ মে।[১]

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি রাতে শেখ মুজিবুর রহমান-কে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি দিয়ে জেল ফটক থেকেই বন্দী করে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯ জুন থেকে শুরু হয় আগরতলা মামলার শুনানি। শুরু হয় সারা পূর্ব পাকিস্তানে তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের গণবিক্ষোভ। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে ১১ দফার ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে। সেই সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে স্লোগান উঠেছিল, 'জাগো বাঙালি জাগো', 'বীরবাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' 'জয়বাংলা', 'তোমার দেশ, আমার দেশ—বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'।[২]

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের বিষয়ে যত ইতিহাস বই আমরা পেয়েছি সেসবই এরকম ঘটনাবহুল রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবরণ দিয়েই পূর্ণ।[৩] রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বা নারীর অবস্থিতি এসব বিবরণে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু যথাযথ ভাবে নারীকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়নি এসব বই-এ। নারীর অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের ইতিহাসে ব্যতিক্রম হিসেবে পেয়েছি। উনসত্তরের গণআন্দোলনে ও অভ্যুত্থানে এদেশের নারীসমাজ ও ছাত্রী সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এই অংশগ্রহণের বিষয়টি সংগ্রামের সাধারণ ইতিহাসে স্থান পায়নি। নারীর লেখা বিভিন্ন বইয়ে উল্লেখিত হয়েছে। সেটাও নারীর ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্রমবিকশিত ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি বহুক্ষেত্রে।[৪]

আমাদের সেই অভাব মনে রেখে এই অধ্যায়ে দৃষ্টি দিতে হবে সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পটভূমির দিকে। একাত্তরের নারী হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়নি বা ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেনি। সেটা বুঝতে হলে পেছন ফিরে তাকাতে হবে বিশ শতকের শুরুর দিকে। শিকড় সন্ধান করতে হবে বা উৎসের সন্ধান করতে হবে।[৫]

বিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশক বৃটিশ শাসনের পরাধীনতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এদেশের জনগণ। সে সময় স্বাধীনতা-স্বদেশী আন্দোলনের উজ্জীবন ঘটেছিল। তা রূপায়িত হয়েছিল সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান সাধনার সামগ্রিক অজস্র ধারার মধ্যে। ব্যক্তি ছিলেন মধ্যমনি। সমাজ-সংস্কৃতির শিকড়ের সাথে এদের মূল্যবোধ সম্পৃক্ত ছিল। আত্মকেন্দ্রিকতার মোহে আবর্তিত ছিলেন না তাঁরা। স্বদেশের স্বাধীনতা এনেছেন, সকলক্ষেত্রে মননশীলতা ও সৃষ্টি সুখের উল্লাস জাগিয়েছেন। নারীসমাজকে মুক্তির সোপানে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-নেতৃত্ব, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী।

কেমন ছিল সে সময়ের সমাজ? নারীর প্রতি ছিল কেমন দৃষ্টিভঙ্গি? ইতিহাস থেকে জানা যায় পশ্চাৎপদ, কুসংস্কার পূর্ণ, ধর্মান্ধ সমাজ নারীকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল অবরোধের বন্ধনে। নারীর ভূমিকা ও মূল্য বিষয়ে সমাজের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে পশ্চাতপদ ধ্যান-ধারণা শিকড় গেড়ে আছে তা সেই সময় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন পুরুষ ও নারী বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের পূর্বসূরীরা।

নারীর মানবাধিকারের অন্যতম প্রবক্তা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) নারীর স্বাধিকারের জন্য, স্বদেশপ্রেমের জন্য, রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য যে পথ তৈরি করেছেন, যে আলো জ্বালিয়েছেন, সমাজকে যেভাবে আলোড়িত করেছেন তা আমাদের বুঝতে হবে। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে আলী জননী বি-আম্মা এবং অ্যানি বেশান্তের কলকাতা আগমন উপলক্ষে যে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয়েছিল, সেই স্বেচ্ছাসেবিকা দলে বহু মুসলিম মেয়ে যোগদান করেছিলেন। এই বাহিনী সংগঠনে মিসেস আর. এস হোসেনের (রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন) অবদান ছিল অসামান্য।[৬]

বৃটিশ ভারতের পূর্ব বাংলায় বিশ শতকের ত্রিশ দশকে বৈপ্লবিক সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন লীলানাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ব বাংলার নেত্রী আশালতা সেন ব্যাপক নারীসমাজকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সংগঠিত করেন। একই সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণের জন্য পথ তৈরি করেছেন জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী, নেলী সেনগুপ্তা, দৌলতুননেসা, হোসনেআরা বেগম (মোদাবের) প্রমুখ।

বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে বিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকের অগ্নিগর্ভ বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের চারটি ধারায়, যথা, বৈপ্লবিক সশস্ত্র ধারা, অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধারা-স্বদেশী আন্দোলনের ধারা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্দোলনের ধারায় নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত

হয়েই দেদীপ্যমান হয়েছিল। বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী যুগের অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রাক্কালে দেওয়া বিবৃতিটি স্মরণীয় :[৭]

> দেশের মুক্তিসংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না? ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে, রাজপুত রমণীরা অসীম সাহসের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা শত্রুর প্রাণসংহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এরূপ আরও কত নারীর বীরত্ব গাঁথায় পূর্ণ। যদি বোনেরা ভাইদের সঙ্গে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, তবে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানে তাহাদের বাধা কি? সশস্ত্র বিদ্রোহে অন্য দেশে বহু নারী যোগদান করিয়াছে, তবে কেন ভারতীয় নারীরা বিপ্লবের এ পন্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিবে?
>
> নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে তাহারা আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। নিজ মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে কোন দুরূহ বা ভয়াবহ ব্যাপারে ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে তাহারা ইচ্ছুক ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই আজিকার এ অভিযানের নেত্রীত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি। আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি যে, আমার দেশের ভগিনীরা আর নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিবাদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এ বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন—এ আশা লইয়াই আমি আজ এ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।
>
> স্বাক্ষর
> প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
> ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং

বীরকন্যা প্রীতিলতার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মদানের অদম্য স্পৃহা প্রভাব ফেলে বিপ্লবী সূর্যসেনের ওপর। দলে নারীদের না নেওয়ার, সশস্ত্র যোদ্ধার দলে নারীকে না নেওয়ার বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে দেয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে তিনি যুদ্ধ যাত্রার আগে আশীর্বাদ করে বলেন

> "বাংলার ঘরে ঘরে বীর যুবকদের আর অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে কালারপোল পর্যন্ত এদেরই দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও এবার সে শক্তির খেলায় মেতেছে। ইতিহাসের সে অধ্যায় আজও অলিখিত রয়ে গেছে। তোমার সাফল্যে বা তোমার আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হয়ে উঠুক—এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক যে, এই দেশের মেয়েরাও আজ আর পিছিয়ে নেই।"[৮]

এই পটভূমির কথা, পশ্চাতপটের কথা আলোচনা করছি এইজন্য যে, বাংলাদেশে নারীর নির্দিষ্ট ভূমিকা নিয়ে সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রে বহু আগে থেকেই দ্বিধা, বিতর্ক ছিল এবং নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে, গণআন্দোলনের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে পুরুষের ভূমিকা যুগ যুগ ধরে সমজে, রাজনীতিতে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। এসব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিক্রমী ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়েও।

বৃটিশ শাসনের অবসানে দেশভাগের পর শুরু হয় মুসলিম লীগ ও পরে সামরিক সরকারের শাসনামল। ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলায় বাঙালি নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ভূমিকা বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। দেশভাগের পর নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান হতে থাকে নির্বাচন ও সমাজসংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে। মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তি জোট বেঁধে এগিয়ে যেতে থাকে। নারীর ক্ষমতায়ন এ সময় চমৎকার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

সামরিক শাসন ১৯৫৮ সালে সশস্ত্র দমননীতির আগ্রাসন চালিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়। নারীর ক্ষমতায়ন চ্যালেঞ্জ করে সামরিক শাসন নারী সমাজকে অবরোধে ঠেলে দিতে প্রয়াসী হয়. সমাজের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে, সাম্প্রদায়িক সংঘাত উসকে দেয়। এই সময় রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে নারী ব্যাপকভাবে দেদীপ্যমান ছিল না। তাই পুরুষ জনগোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ ও কর্মীদের ওপরই দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক দমননীতি, নির্যাতন, কারা আদেশ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছিল। ঘরে ঘরে নারী এদের দমননীতির পরোক্ষ দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করেছে। অত্যাচারিত, নির্যাতিত স্বামী, সন্তান, বাবা, বিভিন্ন আত্মীয়ের সহযোদ্ধা হিসেবে নারী জনগোষ্ঠীর ওপরও অনেক দায়দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ছিল।

আমরা এটাও জানি যে, সেরকম পরিস্থিতির মধ্যেও সমাজ এক মহাকালের অমোঘ নীতি নিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র জনগণের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল প্রতিবাদের ভাষা ও শক্তি। কিন্তু সামাজিকীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমাজপরিবর্তনের ফলাফল ভিন্নতর প্রভাব ঘটায়। নির্দিষ্ট সময়কালের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে নারী বঞ্চিত থাকার কারণে একই ঐতিহাসিক ঘটনা নারীর ওপর পুরুষের তুলনায় ভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে (প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দমননীতি, সামরিক শাসনের সকল কুপ্রভাব সত্ত্বেও পুরুষের অগ্রগতি সাধন ঠিকই)—হয় এই আলোকে নারীর ভিন্ন ভূমিকা পালনের কারণ তার প্রতিবাদের ভাষা ও শক্তি বুঝতে হবে। এসব ভিন্নতা সৃষ্টি হয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে।[৯]

সামাজিক শক্তির বিপ্লবী জাগরণের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল সংগঠিত রাজনৈতিক-ছাত্র আন্দোলন। সামরিক জান্তার সশস্ত্র দমননীতি নেমে এলো ছাত্র জনতার ওপর সামরিক আইন ভঙ্গ করে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম সৃষ্টি হতে হতে এল ঊনসত্তরের গণজাগরণ। ১৯৬৯ এর ১৯ জানুয়ারি ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলীতে শহীদ হলেন আসাদুজ্জামান।[১০]

শিবপুর গ্রামের বাড়ি থেকে আসাদের মা ছাত্রনেতাদের কাছে বাণী পাঠালেন; 'আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলত 'মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে। আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক কর।"[১১]

২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর (৫০০ ছাত্রী) বিরাট শোক মিছিল সারা ঢাকা প্রদক্ষিণ করে। নারীসমাজ ছাত্রদের সাথে

অংশগ্রহণ করে। ২৪ জানুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে হরতাল হলো। পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে ছাত্রদের মিছিল থেকে কালো পতাকা হাতে দীপা দত্ত, তরু আহমেদ (প্রয়াত) এগিয়ে গেলেন। এই বেষ্টনী ভাঙ্গার পর লাখ লাখ ছাত্রজনতা পথে নেমে চললেন পল্টন ময়দানের দিকে। ২৪ জানুয়ারি কবি সুফিয়া কামাল নিজ বাসায় নারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সভা করে ৭ ফেব্রুয়ারি মহিলাসমাজের শোকসভা আহ্বান করেন। ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে মশাল মিছিল হয়—নারীসমাজের প্রতিনিধিরা একাত্মতা ঘোষণা করে যোগ দেন। ২৫ জানুযারি ঢাকায় গুলীতে নিহত হন আনোয়ারা খাতুন ও তার দুগ্ধ পোষ্য শিশু। স্বাধীনতার পর শহীদ আনোয়ারা বেগমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর নামে স্থানীয় স্কুল ও সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন শিক্ষকের স্ত্রী ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ছাত্র জনতার ওপর সরকারের সশস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, 'এ অন্যায় নীতির ভয়াবহ পরিণামের জন্য সরকারকে দায়ী থাকতে হবে।'[১২]

২৮ জানুয়ারি চট্টগ্রামে কালো দিবস পালন করে ছাত্রীরা। বিশাল মিছিল করে। জেএম সেন হলে ছাত্রীরা সভা করে খালেদা খানমের সভানেতৃত্বে। বক্তব্য রাখেন তাসমিন আরা, রাশেদা খানম, হান্নানা বেগম, মমতাজ বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম, শিরিন কামাল প্রমুখ আরও অনেকে।[১৩]

৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭ টা থেকে কারফিউ জারি হবে জেনে ঢাকার নারীসমাজ সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সকাল ১০ টায় শহীদ মিনারে সমাবেশ করে এবং আড়াই হাজার মহিলা মিছিল করে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নওয়াবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে যায়। বোরকা পরা হাজার হাজার পর্দানশীন মহিলা এই মিছিলে যোগদেন। শিশু-কিশোরীরা মায়েদের সাথে যোগ দিয়েছিল। নওয়াবপুর রোড দিয়ে যাবার সময় মহিলাদের মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে রাস্তার দু'পাশ থেকে পুরুষ জনগণ এবং বাড়ির মহিলারা ফুল ও গোলাপ পানি ছিটিয়ে দেন। ১১ দফা দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ছাত্র হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে।[১৪] নারীসমাজের এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সত্ত্বেও নারীর ভূমিকাকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পারিবারিক গণ্ডীতে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য নারী সমাজের মধ্যে দাবিনামা তৈরি করতে প্রেরণা জাগতে থাকে। সমাজ দমননীতি চালাতে থাকে নারীসমাজের ওপর ব্যাপক নারীসমাজকে দেশের মূল রাজনৈতিক প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। নারীর সংগ্রাম করার ইস্যুগুলো ছিল বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক বিরোধী আইন ও সামাজিক নীতি ঠিক করা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি। এসব দাবিনামা রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সমভাবেই উত্থাপিত হচ্ছিল সেই সাথে নারীসমাজ দেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া সামরিক আইনের প্রতিবাদেও মহিলা সংগ্রাম কমিটির কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা শেষ হল। শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দীরা মুক্তি পেলেন। মতিয়া চৌধুরী মুক্তি পেলেন।[১৫]

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ব্যাপক সংখ্যক মহিলা শহীদ দিবস পালন করেন, প্রভাতফেরীতে যোগ দেন। সেই বছরই প্রথম শহীদ দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়।

১৯৬৯ সালের ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলে সর্বস্তরের মানুষ ও নারীরা যোগ দেন। সেই মশাল মিছিলে ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম হাজেরা মাহমুদ, কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা হাসান, বেগম আজিজা ইদ্রিস, রেবেকা মহিউদ্দিন, মালেকা বেগম, দীপা দত্ত প্রমুখ।[১৬]

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ রাত্রি সোয়া ৯ টার পর থেকে পাকিস্তানের সর্বত্র ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারি হলো। শাসনতন্ত্র বাতিল, পরিষদসমূহ বিলুপ্ত করে সামরিক বিধিবিধান দিলেন ফিল্ড মার্শাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।[১৭]

সামরিক শাসনের এই সব বিধিবিধান সাধারণভাবে মানুষকে সমাবেশে, কর্মকাণ্ডে, রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বিষয়ে উদ্বিগ্ন করে এবং ক্রমশ:ই এসব এড়িয়ে চলতে শুরু করে। কিন্তু "যে গণআন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন—সারা দেশে সামরিক শাসন জারি থাকা সত্ত্বেও সে আন্দোলনের দুর্বার স্রোত অব্যাহত রইলো। সভা, মিছিল, হরতাল লাঠিচার্জ গুলী ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।"[১৮]

এই গণআন্দোলন ছিল ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে ওঠার সূত্রপাত স্বরূপ। আন্দোলনে-সভায়-মিছিলে তখনও মহিলাদের প্রকাশ্য উপস্থিতি ছিল নাম মাত্র। কিন্তু যে পুরুষ ছাত্র-রাজনীতিবিদ-জনগণ কাতারে কাতারে নেমে এসেছিলেন রাজপথে, গুলীতে হতেন আহত-নিহত-শহীদ; কারাবরণ করতেন সাহসের সাথে; তাদেরকে মা, স্ত্রী, বোন, মেয়ে অকুতোভয়ে যুদ্ধসাজ পরাতেন, মনোবল জাগাতেন, পিছুটানে আটকাতেন না এসব কোন ইতিহাসে লেখা নেই।

নারীসমাজের জন্য সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি যুদ্ধ সাজের প্রস্তুতি গড়ে তুলেনি। নির্দিষ্ট ভূমিকা নিয়ে নারী সেবাদাত্রী, প্রেরণাদাত্রী, ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাকবে সেটাই প্রচলিত ধ্যান-ধারণা। বাইরের জগৎ নির্দিষ্ট রয়েছে পুরুষের জন্য। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় নারী সংগঠক-কর্মীরা প্রতিবাদ করতো, বলতে চাইতো, অভিযোগ জানাতো আহ্বান জানাতো, প্রচলিত সামাজিক ধারণা ভেঙ্গে নারীর ভূমিকা বদলাতে চাইতো। এদেশের যোদ্ধা নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তৎকালীন পাক সামরিক সরকারের জানা ছিল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও সংগ্রামের ঐতিহ্যিক ঘটনা ও ইতিহাস তাদের জানা ছিল। ব্যতিক্রমী অসম সাহসী বীর নারীদের কর্মকাণ্ডের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিতে পারবে না জেনে (সে সময় এদেশের নারীদের চাকরিজীবী কর্মজীবী ভূমিকার তুলনায় গৃহকর্মের ভূমিকা ছিল প্রধান) পাক সামরিক সরকার পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা বিধান জারি করলেন যে, তারা নিজেরা বা তাদের পরিবারের যে কেউ সরকার বিরোধী কোন প্রচারে বা আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের চাকরি চলে যাবে।

সরকারের এই পরোক্ষ চাপ সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত সরকারি কর্মচারীদের পুত্র সন্তান ও পুরুষ আত্মীয়দের সরকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখতে পরেনি। তৎকালীন অগ্নিকন্যা ছাত্রনেত্রী মতিয়া চৌধুরীর ওপর পুলিশের বড় কর্মকর্তা তাঁর বাবাকে দিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করা হলো। বাবা এবং সরকারি চাপ থেকে অব্যাহতি পাবার লক্ষ্যে মতিয়া চৌধুরী দ্রুতই বাবার অভিভাবকত্ব নাকচ করে বিয়ে করলেন সহযোদ্ধা বজলুর রহমান-কে। এদেশের নারীর জন্য সামাজিক-আইনগত এই বিধিবিধান এখনও রয়েছে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও নারীর একজন অভিভাবক অবশ্যই থাকতে হবে। নারীকে শৈশব-তারুণ্যে বাবার অভিভাবকত্বে, বিয়ের পর স্বামীর অভিভাবকত্বে এবং বৈধব্যে পুত্রের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকতে হয়। ১৯৬০-এর দশকে বিপ্লবী অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীকেও এই অধীনত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে প্রথাভঙ্গ করে এগিয়ে গেলেও সামাজিক-প্রথা ভাঙ্গার সংগ্রাম তিনি করতে পারেন নি বা চাননি। অন্যদিকে কামাল উদ্দিন খান সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাঁর স্ত্রী কবি সুফিয়া কামালের সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য দমননীতির শিকার হন। চাকরিতে তিনি প্রমোশন পাননি দীর্ঘ সময়। কিন্তু স্ত্রী সুফিয়া কামালের সামাজিক-রাজনৈতিক-নারী আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তিনি কোনও বাধা দেন নি বরং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন। বহুভাবে তাঁদের পরিবারের ওপর দমননীতি, চাপ, হয়রানি, তদন্ত চলেছে। কিন্তু তাঁরা অটল ছিলেন সব বাধা ও দমননীতির বিরোধিতা করতে।

১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গঠিত মহিলা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুফিয়া কামাল। সংগঠনের আহ্বায়িকা ছিলেন মালেকা বেগম (লেখক). সদস্যারা ছিলেন সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ের নির্বাচিত সংসদের (সাধারণ পরিষদ) সদস্যা যথাক্রমে জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী, বদরুন্নেসা আহমেদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ. সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, সারা আলী প্রমুখ। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার, নানা স্তরের জনগণ নিজনিজ দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সারাদেশে যখন সামরিক শাসন বিরোধী স্বাধিকারের সংগ্রামে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তখন নারী শ্রমজীবী-পেশাজীবিদের কথা যুক্ত করা হয়নি। নারীদের সব রকম দাবি-আন্দোলন মহিলা সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা ও কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সংগ্রামের সহযোদ্ধা নারীদের কথা ভুলে যাওয়ার এই প্রবণতা সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে পুরুষ সংগ্রামীদের পাশে 'নারী' সহযোদ্ধা হিসাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। ছাত্রী সমাজ নারীসমাজের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেছে।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে কলেজ-স্কুল-মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আয়শা খানম, মুনিরা আক্তার, মাহফুজা খানম, ফাওজিয়া মোসলেম, মিনি মর্জিনা, রোকেয়া কবির, মাখদুমা নার্গিস রত্না, নাজমুন নাহার, কাজী তামান্না, নীলু, রাফিয়া আখতার ডলি, ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম, শামসুন্নাহার ইকু প্রমুখ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের নেত্রীবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

সারাদেশে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক-সংগ্রামী কর্মকাণ্ড ও আহ্বান ছড়িয়ে দেয়া হলো। সমাজ ও পরিবারের মধ্যে নারীর বহু বছরের সাংসারিক দায় দায়িত্বের ভূমিকা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, সেই দায়িত্বের বাইরে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হওয়ার সমর্থন সমাজ-রাজনীতি-পরিবার থেকে মহিলারা অর্জন করতে পারেন নি। তবে বাড়ির ভিতরে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্বামী-বাবা-ভাই-ছেলের পাশে থেকে সমর্থন জানিয়ে তারা কাজ করেছেন মহিলারা। প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান সংগ্রামী পুরুষদের ইতিহাসে নারীর পরোক্ষ এই জরুরি অবদান ও ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের এক বছরের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়। নির্বাচনের প্রচার চালবার অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৯৭০-এর অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছিল। বন্যার জন্য নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে গেল। মহিলাদের সংগঠিত করে স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত মহিলা সংগ্রাম পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল কবি সুফিয়া কামাল-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ।' আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ মহিলা শাখা দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে একাত্মতাপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ থেকে সেসময় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন, রাজবন্দীদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকদের মুজুরি বৈষম্য দূর করা, পর্যাপ্ত সংখ্যায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিসহ নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছিল।

এটা সত্য যে, ব্যাপক নারীসমাজ এই সব সংগঠনের সাথে রাজপথে, সভায়, সেমিনারে যুক্ত হয় নি। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সংঘর্ষপূর্ণ, আন্দোলন মুখী। ছাত্রসমাজ সামরিক শাসন বিরোধী, স্বাধিকারের দাবি সম্বলিত ১১ দফার আন্দোলন শুরু করেছিল। বাড়িতে বাড়িতে এইসব আন্দোলনের ঢেউ নারীসমাজকে জাগিয়ে তুলেছিল পরোক্ষভাবে। স্বামী, ভাই, ছেলে, বাবা—এরকম আত্মীয়সূত্রে নারীসমাজ রাজনৈতিক দেশাত্মবোধের প্রেরণা পাচ্ছিল। ভয়, আশঙ্কা, দ্বিধা স্বাভাবিকভাবেই নারীসমাজের মনে বাসা বেঁধেছিল। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক সশস্ত্র পরিস্থিতির শিকার হয়ে যদি স্বামী-পুত্র-ভাই-বাবা জীবন হারান বা জেলে যান তখন পুরো সংসারের অর্থনৈতিক সামাজিক-নিরাপত্তার কি হবে সেই দুশ্চিন্তা নারীসমাজকে গ্রাস করতো।

বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পুরুষ নির্ভর। তবু সব বাধা-আশঙ্কা তুচ্ছ করে ছাত্র-রাজনীতিবিদরা যখন লাখে লাখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ঘরে ঘরে নারীরাই হাল ধরেছেন সব কিছুর। ইতিমধ্যে নির্বাচনের তারিখ আবার পিছিয়ে গেল ১১ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে উপকূল এলাকার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন-সম্পদ হানির ঘটনায়। ১০ লক্ষ লোক প্রাণ হারান ও ৩০ লক্ষ লোক ধ্বংস আর

শবের স্তূপে মৃত্যুর সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে।[১৯] জনগণ তাদের সর্বস্ব নিয়ে ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক সুলতানা জামানের উদ্যোগে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দেশের নারীসমাজ, ডাক্তার, সংস্কৃতি কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।[২০] ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এদেশের জনগণের জীবনে এনে দিল আশার বাণী। জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়েছিল। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে। আওয়ামী লীগ অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্রে নারীর মর্যাদা, রাজনৈতিক-সামাজিক সমঅধিকার বিষয়ে কোন বক্তব্য ছিল না। নারীপ্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি কোন রাজনৈতিক দল। কিন্তু ভোটার নারীদের মধ্যে কাজ করার জন্য দলে মহিলা সদস্যদের গুরুত্ব ছিল। ১৯৭০ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসন পদ্ধতির নিয়ম বিধি ১৯৬৫'র নিয়ম থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে ছিল 'প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত ৩ জন সদস্যা'-পদ সংরক্ষণের আইন। ১৯৭০ সালে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নে ৭ জন মহিলা সদস্যের আসন সংরক্ষিত রাখার আইন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ আওয়ামী লীগের ৭ জন সদস্যা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হন। যথাক্রমে তাঁরা হচ্ছেন বদরুন্নেসা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, তসলিমা আবেদ, রাজিয়া বানু, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রাফিয়া আক্তার ডলি ও মমতাজ বেগম।[২১]

বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের দুদিন আগে ১ মার্চ ১৯৭১ বেলা ১ টা ৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দিলেন। ঐ দিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের সেনা ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সেদিনই প্রথম বাংলাদেশ তার 'স্ব-শাসন জারি' করতে সক্ষম হলো।[২২]

জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৭ জন সদস্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যরাও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

"সে সময় দলে দলে মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সামাজিক-সংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী দল বেঁধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। এ সময় সামাজিক সহমর্মিতার এক অবিস্মরণীয় বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে সাধারণ মানুষও মুক্তিযুদ্ধের এই প্রস্তুতিপর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠিতভাবে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রাও ছিল উল্লেখযোগ্য।"[২৩]

১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার নিন্দা করে মুসলিম ছাত্রীসংঘের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা শাহানা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান।[২৪]

৫ মার্চ নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি (আপওয়া), পূর্বাঞ্চল শাখা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করে। বিবৃতিতে কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং মুক্ত দেশের মুক্ত মানুষের মতো বাঁচার উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থে যারা জীবন দান করেছেন, তাদের জন্য সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করা হয়।

দেশের স্বাধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য বাংলাদেশের নারীসমাজের প্রতি যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানায় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি।

নিরস্ত্র জনতাকে বেপরোয়া হত্যায় নিন্দা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে বিচারের দাবি জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ ৫ মার্চ পত্রিকায় বিবৃতি প্রচার করে।[২৫]

কবি সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সভা ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে।

পূর্ব বাংলার নারীসমাজ এই সভা থেকে গণআন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছিল।

দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত (৭ মার্চ, ১৯৭১) এই বিষয়ক খবরটি নিম্নরূপ

'গতকাল (শনিবার) ঢাকা শহরের মা-বোনেরা গণআন্দোলনের সহিত সংহতি ঘোষণা করিয়া সভা ও মিছিল করেন। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ এই সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। বিকাল ৩ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মহিলা পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এক প্রস্তাবে নিরীহ ছাত্র জনতা শ্রমিকের প্রতি গুলীবর্ষণ ও হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন এবং প্রস্তাবে ইহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত স্বাধিকার আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সকল গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন সংগঠনের সহ-সভানেত্রী মিসেস সারা আলী, আহ্বায়িকা মালেকা বেগম, অধ্যাপিকা সেলিনা বাহার জামান, নার্স কণিকা ভট্টাচার্য এবং মনোয়ারা বিবি। প্রত্যেক বক্তাই এদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য, গণহত্যার জন্য শাসক গোষ্ঠীকেই দায়ী করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।'

গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধিকারের দাবিতে দেশের শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, শিল্পী, চলচ্চিত্র শিল্পী সমাজের প্রতিক্রিয়া বিবৃতি, ভাষণ, মিছিল সেসময় অব্যাহতভাবে চলছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিরা সক্রিয় ছিলেন।[২৬] পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। সংগ্রামে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার

জন্য দেশবাসী ও নারীসমাজকে আহ্বান জানান পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সভানেত্রী সুফিয়া কামাল ও আহ্বায়িকা মালেকা বেগম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্সের ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ভাষণ দেন। দেশের ছাত্র, জনতা, শ্রমিক, কৃষক, সংস্কৃতি কর্মী, নারীসমাজের বিপুল সংহতি, সংগ্রাম ও অংশগ্রহণের প্রেক্ষপটে এই ভাষণ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।

মুনতাসীর মামুন *সেই সব দিন* বইয়ে লিখেছেন যে, দেশের ভিতরে যখন মার্চ মাসে শুরু হয় সংগ্রামের তীব্রতা তখন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভায় লোকে লোকারণ্য ভীড় স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক শোনার জন্য। 'এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে। বহুলোক এসেছেন তীর ধনুক নিয়ে যেন যুদ্ধ আসন্ন। দেখা গেল মেয়েদের ভীড়ে একজন অশিক্ষিত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজের রচিত গান গাইছে 'মরি হায় হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরান ফাইডা যায়।' দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালী গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি।'[২৭]

পাড়া মহল্লা থেকে ছাত্র-জনতা-নারীরা ব্যাপক সংখ্যায় সভায় যোগদেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্যে সেদিন বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান ছিল নারীসমাজের প্রতি। সেই আহ্বানে ছিল আবেগ ও অঙ্গীকার। তিনি বলেছেন

> আমি আগেই বলে দিয়েছি কোন গোল টেবিল বৈঠক হবে না, যারা আমার মা বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে বসব আমি গোলটেবিল বৈঠকে? যদি একটি গুলি চলে, তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল—যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৮]

ঐতিহাসিক এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীসমাজের সংগ্রামী অংশগ্রহণের স্বীকৃতি দিয়ে প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকাকে দৃশ্যমান করে তুললেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজের অর্ধাংশ নারী গণআন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় সার্বিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু তাদেরকে প্রথম এই আহ্বান জানালেন। অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক-ছাত্র নেতৃবৃন্দ নারীর ভূমিকাকে চিহ্নিত করেননি। সামাজিকীকরণের প্রভাব এদেরকে রাজপথে-সংগ্রামে-সশস্ত্র আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব বুঝতে শেখায়নি। সমাজ শিখিয়েছে যে, নারী ঘরে থাকবে, বাইরে বেরিয়ে আসবে ছাত্র-জনতা। অথচ পুরো সময়কাল জুড়ে নারীসমাজ বাইরে বেরিয়ে এসে ঐতিহ্যিক ভূমিকার বাইরে অবদান রেখেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই অবদান গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতি দিলেন এই বলে যে, গণহত্যাকারীরা এদেশের মা-বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে কোন আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বসবেন না। আহ্বান জানালেন তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার জন্য।

ওই যে নারীসমাজ শুনলেন মা-বোনের কোল শূন্য করার অপরাধে পাক-সরকারকে দায়ী করে শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে বসবেন না বলেছেন, ওই যে

শুনলেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, ওই যে শুনলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে—তখন নারীসমাজের মাতৃহৃদয় আবেগে-আকুলতায় আরও সংগ্রামী হয়ে ওঠে।

সকলে শপথে শপথে সাহসী হয়ে বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়ে, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, মা-বাবা, ভাই-বোনদের সঙ্গে নানা আলোচনা-পরিকল্পনা করলেন। সেসব জানা গেল প্রতিদিনের কুচকাওয়াজে, শরীরচর্চার প্রশিক্ষণে এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য হাতে লাঠি, মাথায় ক্যাপ, পায়ে কেড্‌স, মুখে দৃঢ়তা নিয়ে মনোবল তৈরির সমাবেশগুলোতে যখন মহিলারা একত্রিত হয়ে পরস্পর আলোচনা করতেন, তখন।[২৯]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীসমাজকে, মাতৃহৃদয়কে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছিলেন বলে মহিলারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বাংলার মায়ের কোল শূন্য করার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন—প্রতিটি মানুষের মনে এই কথাটি মহৎ এক তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিল। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান নারীসমাজকে আপ্লুত করেছিল। প্রতিটি ঘর থেকে শুরু করতে হবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলন; ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে; নারীসমাজ এই আহ্বানকে আক্ষরিক অর্থেই গুরুত্ব দিয়েছিল।

দেশের সকল জেলায় মহিলাদের সংগঠিত করে কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র ট্রেনিং-এর মনোবল তৈরি করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা, ছাত্রীদের প্রতিনিধিরা। ঢাকায় যখন কুচকাওয়াজ করতে মহিলারা একত্রিত হতেন কোনদিন সেগুনবাগিচায়, কোনদিন ধানমন্ডির গার্লস কলেজের মাঠে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, অথবা পলাশী, ঝিকাতলা, রায়ের বাজার, কলাবাগান, গোপীবাগ, সূত্রাপুর-গেণ্ডারিয়ায় তখন বিভিন্ন পাড়া থেকে আসা মহিলারা সোৎসাহে বলতেন, ছেলেমেয়েরাও গিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, স্বামী গিয়েছেন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমাবেশে, বাড়িগুলো হয়ে উঠেছে এক একটি দুর্গের মতো। বাড়ির সব মানুষ একই ভাবনায়, সংগ্রামী নানা কাজের তৎপরতায় একাত্ম হয়ে উঠতো। মায়ের আছে কুচকাওয়াজের তাড়া, মেয়ের আছে অস্ত্র চালনা ট্রেনিং-এর তৎপরতা। বাবা আর ছেলেও বেরিয়ে পড়েছেন কোন না কোন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে। কোন অনুযোগ ছিল না কোন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে। কোন অনুযোগ ছিল না সময় মতো রান্না হলো না, খাওয়ার সময় গৃহিণী বা মা কাছে বসলেন না বলে। হাতে হাত লাগিয়ে সংসারের কাজ করার জন্য সবাই ছিলেন কম বেশি তৎপর।[৩০]

মিসেস সারা আলী সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সেগুনবাগিচার বাসার সামনে খোলা বড় মাঠে নিয়মিত লাঠি হাতে মহিলাদের কুচকাওয়াজ যখন হতো ১৯৭১ সালের অসহযোগের সময়, তখন প্রতিদিন যোগ দিয়েছি, দায়িত্ব নিয়েছি অনেক কাজের। রেজা আলীকে (বড় ছেলে এবং '৬০-এর দশকের ছাত্র নেতা) নিয়ে আমি পুলিশ-জেল জুলুমের ভয় পেয়েছি ছাত্র আন্দোলনের সময়। আর '৭১-এর মার্চ মাসে রেজা ভয় পেয়েছে তার নানী জোবেদা খাতুন চৌধুরাণীকে নিয়ে, মাকে নিয়ে ৭০ বছর বয়সেও

এদেশের প্রথম মুসলিম রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী সভা, মিছিল ও কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৯৭০-১৯৭১-এর মার্চ মাসের উত্তাল দিনগুলোতে। তখন তাঁর উত্তরসূরী নারীরা সাহসে বলীয়ান হয়ে উঠতেন।[৩১]

মুক্তিযুদ্ধের সময় জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী দেশেই ছিলেন। নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার প্রথম বিজয় দিবসে তিনি জাতীয় পতাকা হাতে সেগুনবাগিচা এলাকার সকলকে নিয়ে বিজয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন।[৩২]

হোসনে আরা ইসলাম ছিলেন ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভানেত্রী, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের অন্যতম নেত্রী। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ইসলাম সাহেবকে (স্থপতি মাজহারুল ইসলাম) নিয়ে সব সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে চিন্তিত থাকতাম। সাংস্কৃতিক-গণআন্দোলনের কর্মী ছেলে মেয়েদের নিয়েও চিন্তিত থাকতাম। কখন না জানি কী হয়! এখন নিজে বেরিয়ে পড়েছি, সভায়-মিছিলে, যুদ্ধ প্রশিক্ষণে; সবাই বড় উদ্বিগ্ন থাকে, আমার যদি কিছু হয়!'[৩৩]

ষাটের দশক জুড়ে স্থপতি মাজহারুল ইসলাম ও হোসনে আরা ইসলাম দম্পতির পরীবাগের বাড়িটিকে সব রকম কাজের একান্ত নিশ্চিন্ত, গোপন কেন্দ্ররূপে পেয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। বাড়িটি তখন থেকেই দুর্গ রূপে গড়ে উঠেছিল। পুরো পরিবার যুক্ত হয়েছিল সংগ্রামে।

কবি সুফিয়া কামাল সে সময় দীপ্ত স্লোগানে খর দ্রুত পায়ে হাঁটতেন মিছিলের পুরোভাগে। তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে তরুণীরা হিমশিম খেতেন। ব্যাকুল আনন্দে তিনি সকলকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতেন। কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে বুঝিয়েছিলেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটির ৯০ ভাগ দায়িত্ব নারীসমাজকেই নিতে হবে।'[৩৪]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। এর পর ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া-সামরিক জান্তার সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী ১৮ দিন এদেশের নারীসমাজ বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেনি। প্রতিদিন মহিলাদের সভা, প্রতিবাদ, মিছিল লেগেই ছিল। ৮ মার্চ থেকে ভবনে ভবনে কালো পতাকা তোলার কর্মসূচি সফল করেছে মেয়েরা-মায়েরা। অবলীলায় তারা এক টুকরো কালো কাপড় সেলাই করে ছাদে টানিয়ে দিয়েছে। মার্চের ৯ তারিখ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়েছে। সেদিন বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। মহিলাদের সাক্ষাৎকারে জানা যায় এই কাজে নারীসমাজ ও ছাত্রসমাজ বাড়িতে বাড়িতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।[৩৫]

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে প্রতিরোধের জন্য ছাত্রসমাজের কেমন উদ্যোগ ছিল, তা কিভাবে নারীদেরও সম্পৃক্ত করেছিল সে বিষয়ে তথ্য বিভিন্ন জনের লেখা স্মৃতিকথায় পাওয়া যাচ্ছে। এখানে উদ্ধৃত করছি জহিরুল ইসলামের স্মৃতি কথা; *একাত্তরের গেরিলা* বই থেকে :

ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ট্রেনিং দেয়া শুরু হয়েছে। ৭ মার্চ থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন এই ট্রেনিং শুরু করেছে। ছাত্রলীগও অনুরূপ একটি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে। ঝিগাতলা থেকে ছয়জন ছেলে (আমি, দিলু, আফজল, গেশু, কামাল ও দুলু) এবং তিনজন মেয়ে (জাহানারা, রুবী ও খুকু)-এই ট্রেনিং-এ অংশ নিলাম। এর মধ্যে কামাল আমার ছোট ভাই, ১০ম শ্রেণীর ছাত্র এবং জাহানারা আমার ছোট বোন, বদরুন্নেসা সরকারি কলেজে এইচএসসি'র ছাত্রী। অন্য মেয়ে দু'জন জাহানারার বান্ধবী। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ট্রেনিং হচ্ছে। ট্রেনিং বলতে মার্চ পাস্ট, পিটি ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি। আমরা কাঠের ডামি (নকল) রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং নিচ্ছি। ডামি রাইফেল হাতে নিয়ে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছি। মেয়েদের ট্রেনিং মূলত প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি ব্যবস্থা মোকাবেলার ওপর হচ্ছে। পিটি ও কুচকাওয়াজের পর আমরাও জরুরি অবস্থা মোকাবেলার ওপর আলোচনায় অংশ নিচ্ছি। আলোচনার বিষয়বস্তু এরকম—যদি আমরা আর্মি দ্বারা আক্রান্ত হই, তবে শহরের পাড়া মহল্লার মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কি করতে হবে। কি করে মানুষকে সাহায্য করতে হবে। যদি পাড়া মহল্লাগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তবে কি করে মানুষের খাবার, পানি, ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ ও সরবহরাহ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।[৩৬]

ড. মাহফুজুর রহমান বলেছেন

৯ মার্চ চট্টগ্রামে জে এম সেন হলে মহিলা আওয়ামী লীগের সভা হয়। এতে বক্তব্য দেন মেহেরুন্নেসা, বেগম সরাফত উল্লাহ, বেগম নাজনীন, বেগম কামরুন্নাহার, বেগম মুছা খান, কুন্দপ্রভা সেন প্রমুখ। ১১ মার্চ চট্টগ্রামে পূব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে নগরীতে বিরাট মিছিল হয়। বিকেলে জে এম সেন হলে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিরাট সভা হয়। এতে বক্তব্য দেন ডা: নুরুন্নাহার জহুর, মিসেস সেলিনা রহমান, খালেদা খানম, রিজিয়া সুলতানা, গুলশান আরা, জাহানারা আঙ্গুর, সাবেরা শবনম, উম্মে সালমা, মর্জিয়া ইসলাম প্রমুখ। ১২ মার্চ চট্টগ্রাম মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শহরে লাঠি মিছিল হয়। আপওয়ার সভা হয়।[৩৭]

ড. আতিউর রহমান বলেছেন

'১৫ মার্চ খুলনার ছাত্রনেত্রী হাসিনা বানু শিরিন বলেন যে, স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলাদেশের নারীগণ পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে যাবে।'[৩৮]

১৮ মার্চ ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমিতির সভানেত্রী বেগম শাহজাদী হারুনের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জাতীয় সঙ্কটকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার আন্দোলনের বীর সেনানীদেরকে নির্বিচারে হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভার ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী বেগম হোসনে আরা রশিদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনাব খায়রুল আলম খান, রিজিয়া তরফদার, সুশীলা মহল দাস, মায়া বেগম, কনিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তৃতা করেন।[৩৯]

১৮ মার্চ মাইজদী কোর্টের টাউন হলে মহিলাদের এক সভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। বাংলার এই সংকটময় মুহূর্তে মহিলাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। আর্জুমান্দ

বানুকে আহ্বায়িকা নির্বাচিত করে ১৭ সদস্যা বিশিষ্ট একটি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[৪০]

১৮ মার্চ চট্টগ্রামের জে এম সেন হলে মহিলা পরিষদ ও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সভা হয়। সভায় সভানেত্রীত্ব করেন উমরতুল ফজল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালেকা বেগম। বক্তব্য দেন হান্নানা বেগম, সীমা চক্রবর্তী, দিলআফরোজ খানম, জাহানারা আঙ্গুর, আরতি দত্ত, ননী রক্ষিত, নুরুন্নাহার জহুর, রমা দত্ত, কুন্দপ্রভা সেন, মুশতারী শফি প্রমুখ। পরে স্বাধীনতার পক্ষে মিছিল হয়।[৪১]

২১ মার্চ চট্টগ্রাম শাখা মহিলা পরিষদ স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়।[৪২]

২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে স্থানীয় জে এম সেন হলে অনুষ্ঠিত ইদানীংকালের বৃহত্তম মহিলা সমাবেশে ভাষণদানকালে পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ঘোষণা করেন, 'আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি, এই সংগ্রাম আমরা চালাব এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমান সংগ্রামে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মহিলাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা-শোভাযাত্রা করাই যথেষ্ট নয়, সেজন্য সাহস, মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রেরণা থাকা প্রয়োজন।' তিনি নারীজাতিকে চির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে বৃহত্তর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এবং ট্রেনিং গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।[৪৩]

২২ মার্চ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মহিলা পরিষদের সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম বলেন, 'এখন বাংলাদেশের জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জঙ্গি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।' সভায় অন্যান্যের মধ্যে হান্নানা বেগম, কুন্দপ্রভা সেন, সীমা চক্রবর্তী, মুশতারী শফি, শিরিন শরাফতুল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।[৪৪]

২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো। প্রতি বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলার (সবুজ জমিনে লাল সূর্যের সঙ্গে সোনালী রংয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত) নতুন পতাকাও উড়তে থাকে। পল্টন ময়দানে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে দশ প্লাটুন জয়বাংলা বাহিনীর এক প্লাটুন ছিল ছাত্রী। এদের হাতে ছিল ডামি রাইফেল।[৪৫]

তৎকালীন ছাত্রলীগ নেত্রী ফোরকান বেগম লিখেছেন

> ২৩ মার্চ আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বাহিনী পাকিস্তানের বুকে পাকিস্তান ডে-র বিপরীতে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ডে' পালন করি। মেয়েদের মধ্যে শামসুন্নাহার টকু পতাকা হাতে প্যারেডের সামনে চলে, তারপর আমি, সাকী আপা, কাওসার, ঝুনু সহ অন্যান্য মেয়েরা। আমরাই প্যারেডের নেতৃত্ব দেই। আমাদের অনুসরণ করে ছেলেদের দল। ... এই অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরিফ আহমেদ। মার্শাল মনি ও শেখ ফজলুল হক মনি, হাসানুল হক ইনু সহ ক'জন নেতা ।[৪৬]

২৪ মার্চ বাংলার সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের চতুর্বিংশতিতম দিবস অতিবাহিত হয়। শহরের প্রতিটি গৃহে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। নারীদের নিরঙ্কুশ ভূমিকা ছিল পতাকা উত্তোলনে। এই পতাকার জন্য ২৫ মার্চ থেকে বাড়িতে বাড়িতে সেনা-রাজাকার ঢুকেছে, নির্যাতন করেছে। কিন্তু নারীরা তবু হাল ছাড়েনি। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না সেসব কর্মকাণ্ড। নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সহ আরো বহু জেলায় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের শাখা। মনোরমা বসু বরিশালে নেতৃত্ব দেন, সঙ্গে ছিলেন পুষ্পনাগ, রাণী ভট্টাচার্য, সুফিয়া ইসলাম, সাজেদা মতিন, কৃষ্ণাচন্দ, ইলাচন্দ প্রমুখ অনেকেই। উমরতুল ফজল নেতৃত্ব দিয়েছেন চট্টগ্রামে, সেখানে যুক্ত ছিলেন মুশতারী শফি, নূরজাহান খান, হান্নানা বেগম, দিলআফরোজ দিলু, গীতা ঘোষ, চিত্রাবিশ্বাস, রমাদত্ত, সীমা চক্রবর্তী প্রমুখ। পাবনায় নেত্রী ছিলেন রকিবা খাতুন; ঈশ্বরদীতে মিসেস জসীম মণ্ডল; সিলেটে উষাদাশ পুরকায়স্থ, খোদেজা কিবরিয়া; কুমিল্লায় সেলিনা বানু; ময়মনসিংহে সোফিয়া করিম, মজিরুন্নেসা, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, নুরুন্নাহার বেলী, সুমিতা নাহা প্রমুখ। নারায়ণগঞ্জে হেনাদাশ নেতৃত্ব দেন, সঙ্গে ছিলেন নাজমা রহমান, জোবেদা, দীপা, লক্ষ্মীচক্রবর্তী প্রমুখ। নরসিংদীতে যূথিকা চ্যাটার্জি, গৌরী নাহা, ফওজিয়া পারভিন ছিল নিবেদিত। এরকম অন্যান্য জেলাতেও নারীরা সংগঠিত হচ্ছিলেন। প্রবীণ ও নবীন নারী ও ছাত্রীনেত্রীরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার ব্যাপক তৎপরতা জাগিয়েছেন। কবি সুফিয়া কামালের সাথে সেসময় নারী নেত্রীরা বহু জেলায় ঝটিতি সফর করেছেন। নিজেদের বাড়িঘর-সংসার ফেলে তারা ছুটে গিয়েছেন মার্চের উত্তাল দিনগুলিতে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে। ২২ মার্চ চট্টগ্রামে ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে কবি সুফিয়া কামাল ও অন্যান্য নেত্রীদের সর্বশেষ সফর।

আওয়ামী লীগের নেত্রীবৃন্দ যথা, বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, মমতাজ বেগম, রাফিয়া আখতার ডলি প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী (সাবেক ছাত্র নেত্রী) সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে অংশগ্রহণ করেছেন।[৪৭] নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সদস্য-সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।

সংগঠনের সাথে যারা যুক্ত হতে পারেননি নানা কারণে, অসুস্থ প্রবীণ বৃদ্ধ আত্মীয় ঘরে থাকায়, দুগ্ধপোষ শিশু থাকায় অথবা অবরোধে, সংকোচে, গৃহস্থালি কাজের চাপে—তারাও কিন্তু ঘরে ঘরে সচেতন হতে থাকেন, সতর্ক হয়ে ওঠেন সংগ্রামের হাতছানিতে। ছাত্র-ছাত্রী সন্তানটিকে কাছে পেয়ে গভীর রাতের অন্ধকারে শুনে নিতেন তারা সমুদ্রের কলকল গর্জন। নিজের অন্তরে পাঠিয়ে দিতেন সে ডাক। লাখ লাখ মা তাই মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলা যোদ্ধা সন্তানকে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে জনসাধারণের সভা শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীকে চরম আদেশ দিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যান তিনি।

বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন :

'আমি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরের সামরিক অভিযানের সংবাদ জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছি। বেসামরিক জনসাধারণের উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ আসছে, পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকেও প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের সংবাদ আসছে। এসব কিছুই ঘটছে যখন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ঢাকায় আমি তাঁকে অবিলম্বে ঐরূপ সামরিক অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এটা জেনে রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা ও বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া হবে না। আমার আস্থা আছে যে, বাংলাদেশের সাহসী সন্তানেরা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্যে অর্থাৎ 'বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্যে' সর্ব প্রকার পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত।'

[ঢাকা টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র সংবাদ বুলেটিন সান্ধ্য অধিবেশন ২৫ মার্চ ১৯৭১][৪৮]

২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে পাকজান্তা বর্বর সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে হত্যা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র, কর্মচারীদের। হত্যা করে বাঙালি জনগণকে। রুখে দাঁড়ায় লাখ লাখ জনতা। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ।

সূত্র

১. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), ভূমিকা, *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১১।

২. ঐ, পৃ. ১৩।

৩. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন রচিত, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকা, মূলধারা, ১৯৯১, এই বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি (জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান) বিষয়ক বইয়ের আলোচনায় জানা যায় কয়েকটি বইয়ের নাম: মুস্তাফা নূরউল ইসরাম সম্পাদিত *বাংলাদেশ বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে;* মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক;* সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *বাংলাদেশ সশস্ত্র* প্রতিরোধ আন্দোলন; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (৩য় খণ্ড); বশীর আলহেলাল রচিত *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস;* মোস্তফা কামাল; *ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন;* আহমেদ রফিকের *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস;* রফিকুল ইসলামের দুটি বই *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার এবং শহীদ মিনার;* আব্দুল মতিনের *ভাষা ও একুশের আন্দোলন;* ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেডের ৫ খণ্ডে রচিত *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি;* উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ে মাহফুজ উল্লাহর অভ্যুত্থানের *উনসত্তর;* মেজবাহ কামালের *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান;* মোহাম্মদ ফরহাদের *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, সেলিনা হোসেনের *উনসত্তরের গণআন্দোলন*।

৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা, ইউপিএল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২; বেগম মুশতারী শফী *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকা, প্রিয়ম প্রকাশনী, ১৯৯২; মাহমুদ শামসুল হক,

বাঙালি নারী, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০০ এবং আরো বহু বইয়ে নারীর ইতিহাস লেখা হয়েছে। ইতিহাসের সামগ্রিক সমাজ প্রেক্ষাপটে নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়নি বলে নারীর ইতিহাস রচিত হয়েছে।

৫. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১২।

৬. এম আবদুর রহমান, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা,* কলকাতা, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, ১৯৮৭। পৃ. ৬১। এবং শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৫০; পৃ. ১৬৪।

৭. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *বীরকন্যা প্রীতিলতা,* ঢাকা, প্রকাশ ভবন, ১৩৮৫।

৮. মালেকা বেগম, *সূর্যসেনের স্ত্রী পুষ্পাকুন্তলা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী নারীদের কথা,* ঢাকা, প্যাপিরাস, ২০০৩, পৃ. ৭০

৯. মায়দিয়া গুলরুখ এবং মানস চৌধুরী (সম্পাদিত), *কর্তার সংসার,* ঢাকা, রূপান্তর প্রকাশনা, ২০০০, পৃ. ৭৪।

১০. সুফিয়া কামালের ১৯৬৯ সালের ডায়রী (অপ্রকাশিত)। থেকে। সূত্র মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

১১. *দৈনিক আজাদ,* ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০।

১২. *দৈনিক আজাদ,* ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

১৩. ডা. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম,* বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ও চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃ. ২১৫।

১৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪, এবং লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি* ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৭, পৃ. ৫৯১।

১৫. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত।

১৬. *দৈনিক আজাদ,* ঢাকা, ২৪ মার্চ ১৯৬৯।

১৭. প্রেস বিজ্ঞপ্তি, রাওয়াল পিণ্ডি, ২৭শে মার্চ, ১৯৬৯/সূত্র সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস্ ও অন্যান্য বাহিনী,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮-৩৯

১৮. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০, সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধানের ঘোষণা। সূত্র সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২০. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

২১. রেহমান সোবহান, 'সাক্ষাৎকার', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র;* পঞ্চদশ খণ্ড, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮৬

২২. আতিউর রহমান, অসহযোগের দিনগুলি; মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৩

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২৬. মুনতাসীর মামুন, *সেই সব দিন,* ঢাকা, সময় একাশনী; ১৯৯৭, পৃ. ২৮

২৭. *দৈনিক পূর্বদেশ,* ঢাকা, ৮ মার্চ, ১৯৭১, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭১

২৮. মালেকা বেগম কর্তৃক সেই সময়ের অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও স্বয়ং সেই সব সমাবেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে বলা হয়েছে।

২৯. *ঐ*

৩০. *ঐ*

৩১. সাংবাদিক বেবী মওদুদ লেখককে বলেছেন।

৩২. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার।

৩৩. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার।

৩৪. *ঐ*

৩৫. জহিরুল ইসলাম, *একাত্তরের গেরিলা,* ঢাকা, প্রকাশক মিলন নাথ, ১৯৯৭, পৃ. ২০
৩৬. ডা. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১, ২৩২ ও ৩০৮
৩৭. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
৩৮. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৩৯. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৪০. ডা. মাহফুজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
৪১. ঐ, পৃ. ২৩৩
৪২. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৪৩. ঐ, পৃ. ১৫৭
৪৪. *দৈনিক পাকিস্তান,* ঢাকা, ২৪ মার্চ, ১৯৭১, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪৫. ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী,* নারায়ণগঞ্জ, প্রকাশক সাইফ মুহম্মদ আশরাফ আল্‌মদী, নাসিম মুহম্মদ, তৌহিদ আল্‌রুমী, সানিয়া আফরিন নীপা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪
৪৬. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
৪৭. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *সম্মুখ সমরে বাঙালি,* ঢাকা, আগামি প্রকাশনী, ১৯৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের শুরু : নারীর অবস্থান

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে পাকিস্তানী সামরিকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করছি সুকুমার বিশ্বাসের *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল্‌স্ ও অন্যান্য বাহিনী* বই থেকে

> উনিশ শ' একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত। বাঙালির জীবনে দুঃস্বপ্নের কালোরাত। বাংলার বুকে নেমে আসে অত্যাচার, উৎপীড়ন, পাশবিকতা, নৃশংসতা আর হিংস্রতার কালো থাবা। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণ সামরিক সম্ভার নিয়ে শুরু করলো সারা বাংলাদেশ ব্যাপী পৃথিবীর ইতিহাসের এক জঘন্যতম গণহত্যা-ধ্বংসলীলা। রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো চরম নৃশংসতায়। যুদ্ধের সকল নিয়ম কানুন উপেক্ষা করে তারা মেশিনগান, মর্টার আর ট্যাঙ্ক নিয়ে বর্বতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো।[১]

মাঝরাতে পাক সেনাবাহিনীর এই হত্যাযজ্ঞ বিষয়ে অনেকেই ভাবতে পারেননি—রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা-নারী-কেউ না। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসার সামনে ভিড় ছিল নানা স্তরের জনগণের, নারী প্রতিনিধিদের, রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দের। রাত সাড়ে আটটার দিকে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তখনও কেউ ভাবেন নি সশস্ত্র হামলা হবে। সকলে ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাঁর আত্মগোপন করা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু আত্মগোপনে নারাজ ছিলেন। ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার কামাল হোসেন যখন তাঁকে পুনরায় অনুরোধ জানাতে রাতে তাঁর বাসায় গেলেন তখন তিনি নিচের তলায় রাতের খাবার শেষ করেছেন। পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থেকে বঙ্গবন্ধু বললেন

> আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে তিনি বলেন, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে হানাদাররা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক এটা আমি চাই না।[২]

তিনি সে রাতে পাকসেনাদের হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু তাঁকে পেয়েও যে পাকসেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, সাধারণ জনগণের জীবন কেড়ে নিয়েছে—সে কথা বঙ্গবন্ধু জানলেন অনেক পরে। ততদিনে তাঁর নামে মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতার ডাক স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত হয়ে গেছে। তাঁরই নির্দেশ

পালন করে তাজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য এমপি, নেতা মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছেন ১০ এপ্রিল, ১৯৭১। ১১ এপ্রিল এই সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে। স্থানটির নাম দেওয়া হয় 'মুজিবনগর'।

খুব সহজে এই প্রক্রিয়াটি সাধিত হয় নি। রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশাসনিক জটিলতা ছিল। পাকসেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে জনগণ ও ইপিআর-এর প্রতিরোধের লড়াই দেশ জুড়ে চলেছে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পাকসেনারা ছিল সশস্ত্র। আর দেশবাসীর জনসমর্থন, মনোবলই ছিল ইপিআর বাহিনীর নামমাত্র অস্ত্র। প্রতিরোধের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ব্যাপক অংশ ও রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতৃবৃন্দ সীমান্ত দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। কোন পরিকল্পনা ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী হয়ে যান।

বাংলাদেশের ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভারতে গিয়েই পরিকল্পিত মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের সাহায্যের আবেদন করেন। এই আহ্বানে ভারত সরকার সম্মতি জানান। এরপরই বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সরকার কাঠামোতে কোন নারী সাংসদকে বা রাজনৈতিক নারী নেত্রীকে যুক্ত করা হয় নি। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় বাংলাদেশ সরকার। সেই পরিচালনা কমিটিতেও নারীদের যুক্ত করা হয়নি।

১৪ এপ্রিল কর্নেল ওসমানী হলেন 'মুক্তিফৌজ'-এর প্রধান সেনাপতি। প্রথমে ৪টি, পরে ৬টি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের যুদ্ধ এলাকাকে ১১টি সেক্টরে ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয় সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্বে।[৩]

নিয়মিত বাংলাদেশী সেনাবাহিনী গঠিত হয় ১. ফোর্স—মেজর (পরে লে: কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, ২. জেড ফোর্স—মেজর (পরে লে: কর্নেল) জিয়াউর রহমান, ৩. এসফোর্স—মেজর (পরে লে: কর্নেল) কে এম শফিউল্লাহর দায়িত্বে।

সেক্টর ট্রুপস গঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর ও ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে। এদের মুক্তিফৌজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।

গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল বিপুল সংখ্যক যুবকদের নিয়ে। রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক-দেশপ্রেমিক যুবক গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিত। দেশের ভিতরে জনগণের মনোবল ঠিক রাখা, পাকিস্তানী ও অন্যান্য শত্রুদের হঠাৎ আক্রমণ করে পরাজিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নষ্ট করা, দেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করা ও ট্রেনিং-এর জন্য পাঠান; খবরাখবর সংগ্রহ করা, ইত্যাদি তাদের কাজ ছিল।

প্রথমত সেক্টর কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে পরে বিভিন্ন দলের অধীনে গেরিলা ট্রেনিং হতে থাকে।

গেরিলা যুদ্ধের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে স্থানীয় 'বেইজ' বা ঘাঁটি। গেরিলারা ভারতে ট্রেনিং নিলেও তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশের ভিতরে। বেইজ কর্মীরা

মুক্তিযোদ্ধাদের মূল শক্তি ছিল। কোন এলাকা টার্গেট করে বাংলাদেশের ভিতরে যখন গেরিলা, মুক্তিযোদ্ধারা কোন এ্যাকশান টার্গেট করে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিত তখন দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র রাখা, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা, অপারেশন স্থান-টার্গেট ঠিক করে দেওয়া, শত্রুদের গতিবিধির খবর দেওয়া ইত্যাদি সব কাজই করত বেইজ কর্মীরা। এক কথায় বলা চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে বেইজ কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হত। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে বেইজ গড়ে তুলতে রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন হত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণ ছিল 'বেইজ' এলাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রাণশক্তি।

সরকারি নিয়ন্ত্রণে ভাসানী পন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের জন্য আলাদা ক্যাম্প ও বাহিনী ছিল। শ্রীনগরে এ জাতীয় একটি ক্যাম্প-এর কথা জানা গেছে।

বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের গেরিলাবাহিনী গড়ে ওঠে। এর বাইরে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে বহু গেরিলাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর লোকজন ছিলেন। টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, বরিশালের হেমায়েত বাহিনী, স্থানীয়ভাবে গঠিত গেরিলা দল মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনের বাইরে অথচ সরকারের জানামতেই সরাসরি ভারতীয় তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা 'বিএলএফ' গঠিত হয়েছিল।[৩] ভারতের ২টি স্থানে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকার-প্রশাসন-গেরিলা বাহিনী-নিয়মিত বাহিনীর উপরোক্ত বিবরণের আরো বিস্তৃত আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যাবে। অপ্রাসঙ্গিক বলে এই অধ্যায়ে সেসব আলোচনা করা হলো না। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, যোদ্ধাদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থার মধ্যে যুব শিবির, প্রশিক্ষণ শিবির বা ট্রেনিং ক্যাম্প, ট্রানজিট ক্যাম্প, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কিছু আলাদা ক্যাম্প, বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক কাঠামো, তথ্যমন্ত্রণালয়ের নানা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ড ও অবদান—এসব বহু গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কিন্তু নারীসমাজের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা বিষয়ে কোন বক্তব্য এইসব গ্রন্থে নেই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকার যে নীতি নিয়েছেন সেখানে নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, গেরিলা যুদ্ধের জন্য তৈরি করা, প্রশাসনিক কাজের নেতৃত্বে নারী সাংসদদের দায়িত্ব দেওয়া—এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলসমূহ মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে নারীর ভূমিকার ও দায়িত্ব অর্পণের প্রতি যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন তা ন্যায় সঙ্গত হয় নি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে নারীসমাজ সক্রিয় দেশপ্রেমের পরিচয় রেখেছেন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সকল কর্মকাণ্ডে নারী-ছাত্রী সমাজ অংশ নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছেন নারীসমাজ। সম্মুখ সমরে নারীদের অংশগ্রহণের

তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় তৎকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দল থেকে নারীদের শুধুমাত্র অস্ত্র প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যুদ্ধ করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। গোবরা ক্যাম্পে এবং বিএলএফ ক্যাম্পে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, ব্যক্তি উদ্যোগের প্রায় ৩০০ তরুণী ও কিশোরী সংগঠক গোবরা ক্যাম্পে অবস্থান করতো। এরা নানা সূত্রে শরণার্থী ক্যাম্প থেকে, রাজনৈতিক দল থেকে এই ক্যাম্পে যুক্ত হয়েছিল। এদের সকলের নিজস্ব প্রচণ্ড স্পৃহা, দুর্দমনীয় যুদ্ধ-করার প্রতিজ্ঞা, অস্ত্র চালনা শিখে সমুখ মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রচণ্ড মনোবাসনার খবর নানা সূত্রে সরকারের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। সেই সূত্রেই সংগ্রামী যোদ্ধা মেয়েদের জন্য 'গোবরা ক্যাম্প' চালু হয়েছিল। এই ক্যাম্পে মেয়েরা অস্ত্র চালনা শিখেছিল। কিন্তু যুদ্ধ করতে যাবে মেয়েরা—সেটা সরকারিভাবে অনুমোদিত না হওয়ায় গোবরা ক্যাম্পের অকুতোভয় তরুণীরা হতোদ্যম হয়ে গেল। যেকোন শরণার্থী ক্যাম্পের তুলনায় উন্নত খাওয়া, বাসস্থান ইত্যাদির এবং অস্ত্র ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকলেও মূলত: এটি শরণার্থী ক্যাম্পের মতো বিশেষত্বহীন হয়ে গেল। তবু বলতেই হয় গোবরা ক্যাম্প-এর অনুমোদন ও পরিচালনার ব্যবস্থা মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচ্য।

তবে দ্বিধা ছিল, প্রশ্ন ছিল সরকারের মধ্যে—নারীদের কি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পাক সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে? বিভিন্ন যুব শিবিরে যুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য অস্ত্র সংকটে অপেক্ষারত ছিল বিপুল সংখ্যক তরুণ ছেলে। ছেলেরা যেখানে অস্ত্র পাচ্ছেনা, যুদ্ধে যেতে পারছে না, প্রশিক্ষণ পাচ্ছেনা, সেখানে মেয়েদের যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেওয়ার গুরুত্ব আমাদের সরকার ও রাজনীতিবিদদের প্রচলিত ধ্যানধারণায় ছিল না।

গোবরা ক্যাম্প সম্পর্কে ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেকেই বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। গোবরা ক্যাম্পের পরিচালক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেছেন

> 'মা বোনদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের পার্কসার্কাসের গোবরা এলাকায় মহিলাদের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠন করা হয়। আর এই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাকে। এই ক্যাম্পে সিভিল ডিফেন্স; নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। এছাড়াও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন চলতো রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা নারীরা কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, কেউ সেবা দিয়েছেন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন, কেউ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৫]

নারীপ্রগতি সংস্থা কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা নারীদের সংবর্ধনা বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (১৯৯৮) গোবরা ক্যাম্প সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নারীসমাজের অদম্য প্রাণশক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত করার লক্ষ্যে তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, ত্রাণমন্ত্রী কামরুজ্জামান হেনা ও সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধা নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প গঠিত হয়। কলকাতার পদ্মপুকুর ও পার্কসার্কাস-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের কাছাকাছি তিলজলার

গোবরা এলাকায় ১৯৭১ সালে দেশ মাতৃকাকে দখলদার পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প 'গোবরা ক্যাম্প' স্থাপিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা নারীদের জন্য ক্যাম্পটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (বর্তমান সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী) এই ক্যাম্পে সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। নারীকে যুদ্ধ বেশে দেখতে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারকরা অভ্যস্ত নন। এটা যেমন নেই পুরুষের চিন্তায়, তেমনি নেই নারীর চিন্তায়। তা আমরা দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকটভাবে।[৬]

গোবরা ক্যাম্পের বিষয়ে গীতা মজুমদার, গীতাকর, শিরিন বানু মিতিল-এর বলা বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করছি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তরুণীদের অদম্য স্পৃহা ও উদ্যোগ বোঝা যাবে এইসব বিবরণ থেকে। আরও বোঝা যাবে কিভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, সরকারি প্রচলিত নীতি, ধ্যানধারণা, ব্যবস্থা ও নারীর ভূমিকা বিষয়ে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিযোদ্ধা অসমসাহসী তরুণীদের হতোদ্যম হতে বাধ্য করেছে।

গীতা মজুমদার :[৭]

'একাত্তরে যখন কলকাতা যাই, তখন তো মনে মনে অবশ্যই একটা ভাবনা ছিল দেশের জন্যে সামান্য হলেও কিছু করা যায় কিনা। সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এ সময় দেখা হয়ে যায় আমার ফরিদপুরের স্কুল জীবনের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর সঙ্গে। উনি আমাকে বললেন, 'আমরা মেয়েদের নিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করছি। এই ধর মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং এবং ফার্স্ট এইড ট্রেনিং দিয়ে তাদের ফিল্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা নিয়েছি।' স্যারের প্রস্তাবে আমি রাজী হয়ে গেলাম। তখন বাড়ি থেকে ভীষণ আপত্তি তুলেছিল। যে রকমটা সাধারণত আমাদের দেশে হয়ে থাকে। পিতৃপ্রধান পরিবার ভাবতেই পারে না, মেয়েদের নিয়ে কিছু করা যায়। তা সত্ত্বেও আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি কিভাবে কি করা যায়।

এরপর আওয়ামী লীগের সাজেদা চৌধুরী, উনি এই ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা অর্গানাইজ করছিলেন। উনি আমাদের বেশ কিছু মেয়েকে ট্রেনিংয়ে নিয়োগ করে ফিল্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম দিকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং দেয়া হয়। ফার্স্ট এইড অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেয়নি। পরে ঠিক হলো, কিছু কিছু প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেয়া হবে। তখন আমাদের মধ্য থেকে ৪০ জন মেয়েকে বাছাই করা হলো ফার্স্ট এইড ট্রেনিংয়ের জন্যে। সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্সের সহযোগিতায় এই ট্রেনিংটা আমরা নিই। এটা হলো নীলরতন হাসপাতালে। এই ৪০ জনের মধ্য থেকে আবার ১৬ জনকে বাছাই করে আগরতলা গুপ্তাখালি সীমান্তে যোদ্ধা ইন্ডিয়ান আর্মিদের নার্সিং-এর জন্য পাঠানো হয়। যখন পাঠানো হয়, তখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমাদের অজ্ঞাত ছিল। পরে আমরা বললাম, 'আমরা ভারতীয় সৈনিকদের সেবা দেব না, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠানো হোক।'

গুপ্তাখালি ক্যাম্পটা ছিল মূলত ইন্ডিয়ান আর্মিদের অধীনে। এখানে বেশ কিছু শরণার্থী ছিল। সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল খারাপ। আর মোটে আমরা ১৬

জন মেয়ে—কি করবো, কোথায় যাবো। এসব ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। কেননা ট্রেনিংয়ের শুরুতেই আমাদের অর্গানাইজিং কমিটির সাথে বেশ কিছু বাদানুবাদ এবং মত বিরোধিতা হয়েছিল। পরে তো আমরা ভুল করে চলে এলাম গুপ্তাখালি ক্যাম্পে। তারাও আমাদের আর খোঁজ খবর করেনি বোধ হয় ওই কারণে।

যাহোক আমরা খুব চেষ্টা করছিলাম, যাতে কোন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগাযোগ করা যায়। মানসিক বিভ্রান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে ১৬ দিন কেটে যায়। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। বিশ থেকে ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল অপারেশনে যাওয়ার পথে ওপ্তাখালির কাছেই ট্রাক উল্টে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। এই মুক্তিযোদ্ধাদের আমাদের ক্যাম্পে আনা হয়। বিশেষ করে তাদের কাছে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ছিল—গ্রেনেড, টোটা ভর্তি বন্দুক, মেশিনগান, মর্টার-ফর্টার অনেক কিছু এইসব বাস্ট করেই মূলতঃ তাঁরা আহত হয়েছিলেন। আমাদের কাছে তো তেমন কিছু ছিল না, ছোট ছোট গজ-ব্যান্ডেজ, অল্প অল্প ওষুধ—এইসব দিয়েই তাঁদের চিকিৎসা করেছি। এই ঘটনাটি আমাকে আরো নির্ভীক এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল। এ পর্যন্ত আমরা মানসিক দিক দিয়ে যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম সেটা কেটে গেল।

তখন যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি, এখনো ভাবলে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠি। একেক জনের মধ্যে সে কি স্পিরিট, কি ইমোশন! একজনের চোখ দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে, তবু বলছেন, 'আমার চোখ লাগবে না, আমাকে কোনরকমে পৌঁছে দিন ফ্রন্টে, আমি ঠিক যুদ্ধ করতে পারবো।' একজনের পা নেই, কারো হাত নেই, কারো আবার গোটা মুখটাই ঝলসে গেছে, সবারই ওই এক কথা, 'আমাকে ফ্রন্টে পৌঁছে দিন।' মেয়ে হিসেবে মনের যে দুর্বলতাটা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না, এঁদের দেখে সেটা অনায়াসে কেটে গেছে। এবং তখন যে কোন অবস্থাকে মোকাবেলা করবার মতন মনের অবস্থা তৈরি হয়েছে। ওপ্তাখালি শরণার্থী ক্যাম্পে এর মধ্যে ১৬টা দিন কেটে গেছে। কলকাতা থেকে আগরতলা এবং যখন আমরা বিশ্রামগঞ্জের বাংলাদেশ হাসপাতালে পৌঁছেছি তার মধ্যে এতগুলো দিন পার করে দিয়েছি। আহত মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, এরপর আমরা কোথায় যাবো? আমরা তো কোনভাবেই ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না কোথায় যাবো! আমাদের যাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাদের পাত্তা ছিল না; এবং আমরাও কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না।

এদিক সময় চলে যাচ্ছিল, নষ্ট করবার মত সময় ছিল না হাতে। ক্যাম্পেরই এক ভদ্রলোক (মাখন সোম) আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন এ ব্যাপারে। উনি আমাদের তাঁর বোনের বাড়িতে রেখেছিলেন শেষ দিকে! ওটাও একটা ক্যাম্পের মতন ছিল। ওই ভদ্রলোকের সহযোগিতায় আগরতলা থেকে সাজেদা চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো ফোনে। উনি বললেন, 'আগরতলায় একটা হাসপাতাল ক্যাম্প আছে, ওখানে যেতে পারো।' মাখন সোমের সাহায্যে এরপর আমরা আগরতলায় এলাম। আগরতলায় এসে আমার মনে পড়েছিল সেই বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা। বিচিত্র এক অনুভূতি হয়েছিল তখন।

বাংলাদেশ হাসপাতালে কাজ করতে পেরে আমি সুখী হয়েছিলাম, যাক তবু কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল বলে।

... ষোলজন মেয়ের মধ্যে আমরা ছিলাম গীতাকর, ইরা, অনিলা, লক্ষ্মী, শোভা, শেফালী, রঞ্জিতা, অঞ্জলী, যূথিকা, আন্না এবং আরও অনেকে।"

গীতা কর[৮]
ওপারে গিয়েছিলাম যুদ্ধ করতে

'আমার পৈতৃক নিবাস রাজবাড়ি। আমরা ১১ বোন (কোন ভাই নেই)। বাবা মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছিলাম ধীরে ধীরে। আমাদের জীবনযাত্রা ছিল শান্ত নদীটির মতো, কিন্তু ১৯৭১ সালে এই শান্ত জীবনে ঢেউ উঠলো।

তখন আমার বয়স মাত্র ১৫ বছর। তবু আজও মনে পরে সেই উত্তাল দিনগুলো। বিক্ষোভ আর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে দেশ তখন টালমাটাল। আমাদের রাজবাড়িতে এই ঢেউ এসে লেগেছিল।

১৯৭১ এর মার্চ মাসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাঙালিদের হত্যার মাধ্যমে শুরু করলো নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। এরপর থেকে অবস্থা দ্রুত বদলে যেতে থাকে। দেশব্যাপী লুটতরাজ। নির্যাতন ও অন্যান্য অরাজকতার ফলে মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা চার বোন বাবার সাথে গ্রামের বাড়িতে যাই নিরাপদ আশ্রয়ে। মামা বাড়িতে আশ্রয় নেবার দুসপ্তাহের মধ্যে আমাদের বাবাকে স্থানীয় বিহারী ও পাকবাহিনীরা হত্যা করে। সে দিনটা ছিল ৫ মে '৭১।

এই ঘটনায় হতবিহ্বল হয়ে ছোট কয়েকজন বোনসহ মাকে গ্রামের বাড়িতে রেখে একটি দলের সাথে উদ্দেশ্যহীনভাবে যাত্রা শুরু করি। কোথায় যাবো তার কোন ঠিক ঠিকানা জানতাম না। এভাবে ৯ দিন পায়ে হেঁটে চলার পর ভারতে প্রবেশ করি।

ওখানে পৌঁছে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি দেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করবো। দেশের মুক্তির লড়াইয়ে যোগ দেবার আশায় খোঁজ খবর করার এক পর্যায়ে জানতে পারলাম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংগঠিত করা হচ্ছে সীমান্তে চলে আসা সর্বস্তরের মানুষকে। এক মাস ঘোরাঘুরির পর আমি মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাতে সক্ষম হলাম। প্রশিক্ষণের জন্য ২ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে ক্যাম্পে যোগ দেই। ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধ কৌশল থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক চিকিৎসার উপরও প্রশিক্ষণ নেই।

দুই শতের অধিক মেয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ দলে ছিল। এদের কেউ বাবা হারিয়েছে, কেউ মা অথবা অন্য কাউকে। সে সময় প্রত্যেকের চোখে দেখেছি দেশমাতৃকাকে হানাদারের কবল থেকে মুক্ত করার এবং প্রিয়জনদের হত্যার বদলা নেবার দৃপ্ত আগুন।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে খাবারের মান ও পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলনা। আমরা পেতাম বড় ১ কাপ চা, কাঁকর মিশ্রিত ভাত আর সামান্য ডাল ও সব্জি। কিন্তু তখন যুদ্ধে যাবার স্পৃহা মনের মধ্যে এমনই টনিকের কাজ করছিল যে, খাদ্যের মান ও

পরিমাণ তাতে কিছুমাত্র ছায়াপাত করেনি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন ক্ষোভ ছিল না। বরং তখন এই সত্য মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলাম যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষকে আমূল বদলে দিতে পারে।

যাহোক, প্রশিক্ষণ তো শেষ হলো। যুদ্ধে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছি তখন ডাক এলো কে কে যাবে? আমাদের ভেতর থেকে ছোট ছোট ১৫ জন মেয়ে সম্মতি জানালাম। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য এমন একজনকে দেয়া হলো যার সাথে কোন ভাষাতেই (বাংলা/ইংরেজি) কথা বলা যায় না, সেও বোঝে না। এ অবস্থায় সে ভদ্রলোক একদিন আমাদের ফেলে কোথায় উধাও হলেন তার কোন খোঁজ খবর পেলাম না। পথঘাট কিছু জানা না থাকায় আমরা পড়লাম অকূল পাথারে। কিন্তু তা বলে বসে থাকারও তো উপায় নেই। শুরু হলো আবার পথ চলা কোন গাইড ছাড়াই। ১০ দিন অভুক্ত থেকে কেবল কলা আর পানিতে পেট ভরিয়ে চলছি। এভাবে হালছেঁড়া নৌকার মত ভাসতে ভাসতে সিলেটের বর্ডারে গিয়ে পৌঁছলাম। ভারতীয় জওয়ানরা 'গুপ্তচর' সন্দেহে আমাদের আটক করে বসল। এতে কয়েকজন ঘাবড়ে গেলেও অন্যরা প্রতিবাদ করলো। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ভারতীয়দের বোঝাতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছিল। বিশেষ করে গোপালগঞ্জের অনিলা বিশ্বাস এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয়বাহিনীর সন্দেহ নিরসনে সক্ষম হলেও আমাদের তখন দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা ছিল না। বিশেষত গত ১০ দিনের পর প্রায় অভুক্ত শরীরে এই ধকল আর সইছিল না। কেউ কেউ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পরে ওখানেই বসে পড়ল। এ সময় শরণার্থী ক্যাম্প থেকে মাখন সোম নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন। উনিই আমাদের খাবারের জোগাড় করে দিলেন। ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে দেখে কাঠ, পাতা এনে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন।

মাখন সোমের সহায়তায় বুক ভরা আশা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা ১৫ জন আগরতলা পৌঁছাতে সক্ষম হলাম। যুদ্ধে যাবার সাধ তখনো পূর্ণ হলো না। তার বদলে আমাদের ৪৮০ বেডের একটি হাসপাতালের কাজে সহায়তা করতে বলা হলো। তা হোক, মনে মনে ভাবলাম যুদ্ধাহতদের সেবা করাও তো যুদ্ধযাত্রার সামিল। তাই মন প্রাণ ঢেলে যুদ্ধাহতদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম।

শুশ্রূষা করার সময় অপরিচয়ের বাঁধন কখন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে নিজেও জানতে পারলাম না। মনে হতো যুদ্ধে আহত হয়ে ঐ যে হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছে ওটি আমার ভাই।

এখানে বাংলাদেশ হাসপাতালের অন্যান্যদের সম্পর্কে একটু বলতে চাই। বাংলাদেশ হাসপাতালের যারা প্রাণ দিলেন তারা হলেন : ডা. জাফরুল্লা চৌধুরী, ডা. সেতারা, ডা. নাজিমউদ্দিন আহমেদ, ডা. মোবিন, কবি সুফিয়া কামালের কন্যা সাঈদা কামাল টুলু ও সুলতানা কামাল লুলু, পদ্মা ও আরো অনেকে। এখানে কাজ করতে করতেই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, একদিন দেশ শত্রু কবল থেকে মুক্ত হবেই। আমাদের ভাইদের, বোনদের এমন মরণ জয়ী লড়াইয়ে সাফল্য না এসে কি পারে?

অবশেষে এলো ডিসেম্বরের সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। তখন আমরা বাংলাদেশ হাসপাতালে কাজ করে চলেছি। ১৬ ডিসেম্বরের পর প্রায় ৫ সপ্তাহ সেখানে ছিলাম

আমরা। জানুয়ারি (১৯৭২) সালের শেষ সপ্তাহে কাজ গুটিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি আহত মুক্তযোদ্ধাদের নিয়ে। কুমিল্লায় ৭ দিন অবস্থানের পর ঢাকায় যাই।

ইতিমধ্যে সহকর্মীদের প্রায় সবাই যে যার বাড়িতে চলে গেল। স্বাধীনতা লাভের আনন্দে আমার চোখে তখন অশ্রু। পারি তো পানিতে ঝাঁপ দিই প্রাণ ভরে কাঁদি। কিন্তু কোথায় যাবো আমি, কার কাছে যাবো? বাবা আমার কোথায় হারিয়ে গেলেন?'

শিরীন বানু মিতিল[৯]

পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেছি

'১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি ছিলাম পাবনাতে। পাবনার প্রতিরোধ সংগ্রামের শুরুতে আমিও জড়িয়ে পড়ি প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বক্তৃতা শোনার পর ছেলেদের সাথে রাস্তায় নেমে পড়ি এবং একসাথে ব্যারিকেড তৈরি করি।

পাবনায় তৈরি প্রতিরোধের প্রাচীর শক্ত না হওয়াতে আমাদের পক্ষে একটি দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীকে শহরে প্রবেশ ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। শহরে পাকসেনারা ঢুকে যায়। ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত আমি পাবনাতে স্থিতিশীল ছিলাম। ১৯ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। আমরা তখন ওই সরকারের আনুগত্য স্বীকার করি এবং স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের কাজকে আরো সুদৃঢ় করার চিন্তা করি। নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করার লক্ষ্যে এবং নিরাপত্তার কারণে ধীরে ধীরে খুলনার পথে পা বাড়াই। যেহেতু আমি ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম সে কারণে আমার একটি দল ছিল। আমি আমার দলের সাথে নৌকায় চড়ে রওনা হই খুলনার দিকে। দলের সদস্যরা বা অন্য কেউ যাতে আমাকে মেয়ে হিসেবে সনাক্ত করতে না পারে তার জন্য আমি ছেলেদের পোষাক অর্থাৎ প্যান্ট সার্ট পরেছিলাম এবং মাথার চুল ছেলেদের মত ছোট করে ছেটে ফেলেছিলাম।

আমি যে মেয়ে এই কথাটি তখন মাত্র দুজন ব্যক্তি জানতেন এবং তারা সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে এই সত্যটি গোপন রেখেছিলেন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে। পাবনা ছাত্র আন্দোলনের জেলা সভাপতির সাথে যাওয়ার সময় অনেকেই প্রশ্ন করেছেন "ও কি মিতিলের ছোট ভাই"?

বেশভূষা দেখে আমাকে ছেলে ছাড়া মেয়ে কল্পনা করা সে সময় একেবারেই অসম্ভব ছিল। আমার সাথীটি এই প্রশ্নের জবাবে সহাস্যে বলেছিলেন—'হ্যাঁ ও মিতিলের ছোট ভাই'।

এর ফলে আমি ছেলে হিসেবে দলের সদস্যদের কাছে পরিচিত হয়ে গেলাম। এই পরিচয় আমাকে আমার কাজে বিস্তর সাহায্য করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে রাস্তায় পুলিশ নামার সাথে সাথে আমার হাতে রাইফেলও চলে আসে। রাইফেল হাতে আমি বেশ কটা জায়গাও ঘুরে আসি। আমার ডিউটি পড়ে একটি কন্ট্রোল রুমে। যে কন্ট্রোল রুমে আমার ডিউটি পড়েছিল তার ডিসি ছিলেন জনাব কাদের। তিনি ও পাবনা ন্যাপের

প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বাদশা এবং জাহিদ হোসেন ছাড়া অন্য সকলের কাছে আমার পরিচয় ছিল গোপন। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত কন্ট্রোল রুমে আমি ডিউটি করেছি। রাজশাহী থেকে আসা একদল মুক্তিযোদ্ধার তত্ত্বাবধানও ছিল আমার কাজ। এই দলের কাজ আমি ছেলে হিসেবে করেছি। মেয়ে হিসেবে কাজ করার উপায় ছিল না বলে।

ছেলেদের কাজ করার সময় এমনকি বিশ্রামের সময় ছেলেদের পাশে ছেলে হিসেবে থেকেছি ও ঘুমিয়েছি। কেউ আমার আসল পরিচয় পায় নি। ফলে সুবিধা হয়েছিল প্রচুর।

সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতা আসার পর আমি জানিনা কি করে কাজে লেগে গেলাম। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার এক সাংবাদিক আমার একটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন।

এরপর যখন বাংলাদেশে ফিরে আসি তখন আমাকে কেউ আর চিনতে পারে নি। স্বাভাবিক অবস্থায় ছেলে হিসেবে কখনো কাজ করা যায় না। দলের কাছে মেয়ে হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পর থেকে দলের সবাই আমাকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে—'এখন আপনি কি করতে চান?' মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্যাম্প স্থাপিত হওয়ার খবর আসাতে আমাকে এরপর সেই ক্যাম্পে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ সরকার যেভাবে আমাদের কাজ দিতেন আমরা দায়িত্বের সাথে তা করতাম। বন্দুক হাতে নিলেও আমি বন্দুক থেকে গুলি খরচ করি নি।

পরবর্তীকালে এক সময় আমি মেজর জলিলকে বলেছিলাম, 'যুদ্ধ যদি করতে হয় করবো। তবে বন্দুক চাই।' আমি জানতাম মেজর জলিল একটি নারীবাহিনী তৈরি করেছিলেন। কলকাতা থেকে আগরতলা আসার পর আমরা আলাদাভাবে কাজ করি। আমার সাথে বিভা সরকার, যূথিকা চ্যাটার্জি, মনিকা ব্যানার্জি, গীতাকর, ইরা, গীতা মজুমদার সহ আরও অনেক মেয়ে ছিল। নাজমা, সাজেদা ছিল যশোরের একটি দলের সাথে।"

এরকমই ছিল মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় যুদ্ধ করতে আগ্রহী তরুণীদের মনের অবস্থা এবং বাস্তবে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা। যুদ্ধ পরিস্থিতি নারীর নিরাপত্তা হরণ করেছিল, সম্মান, মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছিল। পাকসেনা ও রাজাকারদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল দুই লাখ নারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীর প্রতি তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলের পুরনো ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পাকসেনাবাহিনীর সশস্ত্র যুদ্ধ-গণহত্যা-ধর্ষণ-এসব অপরাধ শুরু হলো। বাংলাদেশের কোন নাগরিকেরই নিরাপত্তা ছিলনা। পাকসেনার গুলিতে প্রাণ হরণ নিত্যকার ঘটনা ছিল। নারীদের নিরাপত্তার অভাব শুধু জীবন-প্রাণহানি নয়; 'সম্ভ্রমহানি'র জন্যও ঘটে—এই হচ্ছে চলতি ধ্যান-ধারণা। পাকসেনাদের বর্বর নির্যাতন নারীর নিরাপত্তার অভাব ঘটিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। পরিবার গ্রহণ করবে না 'সম্ভ্রম'হীনা নারীদের, নারীর সম্ভ্রম গেলে আর কি থাকে—এরকমই ছিল সাধারণ মনোভাব। দু'জনের বক্তব্য তুলে ধরছি এই বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য :

১. মোহাম্মদ সালেহুজ্জামান, সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, (রমনা থানা ঢাকা) বলেছেন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আমি এক প্লাটুন ফোর্স সহ মীরপুর এক নম্বর সেকশনে টহলে ছিলাম। ... রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় আমার ওয়ারলেস সেটটি অকস্মাৎ সক্রিয় হয়ে উঠে। ... 'বাঙ্গালী পুলিশ তোমরা সাবধান হও। ... রাত সাড়ে চারটার দিকে পাক পশুরা পুলিশ কন্ট্রোল রুম দখল করে সেখানকার ওয়ারলেসে বাইরে টহল নিযুক্ত বাঙালি পুলিশদের কর্কশ কণ্ঠে বলছিল 'বাঙালি শালা লোগ, আভী আ-কার দেখো, তোমারা কেতনা মা বাহেন হামারা পাস হায়, ...' একথা শুনে আমাদের বাঙালি পুলিশদের গা শিউরে ওঠে। পাকসেনারা দু'টি যুবতী মেয়েকে তাদের জীপে উঠিয়ে নিয়ে যায় মেয়ে দুটি পাকপশুদের হাতে পড়ে প্রাণফাটা চিৎকারে আর্তনাদ করছিল।[৯]

২. মিসেস রাবেয়া খাতুন, সুইপার, রাজার বাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বলেছেন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে আমি রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকেই ছিলাম। ক্যান্টিনের কামড়া থেকে বন্দুকের নলের মুখে (পাকসেনারা) আমাকেও বের করে আনা হয়। আমার উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। ... পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙালি যুবতী, মেয়ে মিলিটারী জীপে ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। রাজারবাগ হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল ।[১০]

মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ বাংলাদেশে নারী এভাবেই নির্যাতিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে মেয়েদের যুদ্ধে পাঠালে এর চেয়ে আর বেশি কি নির্যাতন সইতে হতো মেয়েদের? যুদ্ধের সময় বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে। কিন্তু ১৯৭১ সালে পাকসেনা কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সময় জেনেভা কনভেনশনের প্রতি কোন সম্মান দেখানো হয় নি।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সরকার গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ভাষণ দেন। তিনি বলেন

স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাই বোনেরা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তি পাগল গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। যাঁদের হাতে আজও আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারিনি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, শীঘ্রই আপনাদের হাতে আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারব। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নেবার জন্য নিকটবর্তী সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যাঁদের হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই তাঁদেরও এই জনযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে।

শত্রুর ছত্রী ও গুপ্ত বাহিনীকে অকেজো করে দেবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতাসহ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সম্মুখ সমরে কাজ না করতে পারলেও আপনি রাস্তা কেটে, পুল উড়িয়ে দিয়ে এবং আরো নানাভাবে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে হয়রান ও কাবু

করতে পারেন। নদীপথে শত্রু যাতে না আসতে পারে তার সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে ও সবদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। নদীপথে সমস্ত ফেরী লঞ্চ ও ফ্লাট অকেজো করে দিতে হবে। এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছোট ছোট দলে সংগঠিত হতে হবে। এর জন্য আপনার এলাকার সমর পরিচালকের সাথে সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাঁর আদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে।

যুদ্ধে অংশ নেয়া ছাড়াও বাংলাদেশকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকেও অবহেলা করলে চলবে না। শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বাঙালি অফিসারদের মধ্যে যারা এখনও আমাদের সাথে যোগদিতে পারেন নি, তাঁরা যে যেখানেই থাকুক না কেন, আমরা তাঁদেরকে মুক্ত এলাকায় চলে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। সংবাদপত্রসেবী, বেতার শিল্পী, গায়ক ও চারুশিল্পীদের আহ্বান জানাচ্ছি—তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আমাদের সামনে বহুবিধ কাজ, তারজন্য বহু পারদর্শীর প্রয়োজন এবং আপনারা প্রত্যেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাবেন।

আমাদের যে সমস্ত ভাইবোন শত্রুকবলিত শহরগুলোতে মৃত্যু ও অসম্মানের নাগপাশে আবদ্ধ, আদিম নৃশংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাহস ও বিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথ চেয়ে আছেন তাঁদেরকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। যাঁরা আমাদের সংগ্রামে শরিক হতে চান তাঁদের জন্য রইল আমাদের আমন্ত্রণ। যাঁদের পক্ষে নেহাৎই মুক্ত এলাকায় আসা সম্ভব নয় তাঁদেরকে আমরা আশ্বাস এবং প্রেরণা দিচ্ছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, শহীদ ভাইবোনদের বিদেহী আত্মার পক্ষ থেকে। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না।[১১]

এই ভাষণের মধ্যে আমরা পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি আহ্বান জেনেছি। কিন্তু সামগ্রিক ব্যবস্থাদি ছিল পুরুষদের অংশগ্রহণের অনুকূলে। নারীর জন্য ছিল আইনগত, নীতিগত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা। আমরা সব সময় লক্ষ্য করেছি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে সরকারি এই ধরনের ভাষণে বলা হয়েছে পুরুষ ব্যক্তিদের গৌরবময় অবদানের কথা

আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না যে, এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকার অর্থে একথাই বলতে হয় যে, এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, জনতা তাঁদের সাহস, তাঁদের দেশপ্রেম, তাঁদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাঁদের নিমগ্ন প্রাণ, তাঁদের আত্মাহুতি, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। ...[১২]

এরপরই সরকারি কর্মকর্তা, প্রধান ব্যক্তিদের মনে পড়ে যায় নারীদের কথা এবং যোগ করে দেন একটি বাক্য মাত্র 'বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, সেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। ... এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাতকোটি বীর বাঙালি ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। ১১ এপ্রিল, ১৯৭১।'[১৩]

এই সব ভাষণের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গির মূলে আছে সমাজ। আমাদের নারীসমাজকে প্রকাশ্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার কথা সমাজ, সরকার, রাজনৈতিক দল ভাবতেই পারেনি। কিন্তু বাস্তবে দেখছেন দেশের ভিতরে ও বাইরে শরণার্থী ক্যাম্পে ও রাজপথে জনপদে ছেলেদের সাথে মেয়েরা, পুরুষের সাথে নারীরা রয়েছেন, পাকবাহিনীর অস্ত্র

তাক করা হয়েছে নারী-পুরুষের দিকে। তাই 'ভাইবোনের' কথা একসাথে উচ্চারিত হয় ভবিষ্যতের জন্য।

দায়িত্বশীল সরকারি (তৎকালীন) প্রবক্তাদের সাক্ষাৎকার থেকে আমরা পাচ্ছি নানা অভিব্যক্তির কথা; প্রচারক বুদ্ধিজীবীদের কথা, এইভাবে

> পর্বত সমান লাশের নিচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছেলেদের রক্ত ও ঘামে মিশে জন্ম নিচ্ছে নতুন বাংলাদেশের।[১৪]

এই দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের অবদানের কথা। যে মুক্তিযোদ্ধাদের তারা দেখেছেন তাদেরই কথা বলেছেন। সরকারের নীতিতে, বাধাধরা প্রশাসনিক আইনে ছেলেদেরই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ভারতে গড়ে তোলা 'মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে', যুদ্ধক্ষেত্রে ছেলেরাই গিয়েছে অস্ত্র হাতে। এরই ফলশ্রুতিতেই একদেশদর্শী সব অভিব্যক্তি ভাষণ ও দলিলপত্র তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে নেই নারীর অবস্থান।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র'—গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বহু ব্যক্তির, নীতি নির্ধারক ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারে পাওয়া গিয়েছে সেসময়ের বিবরণ। নারীসমাজের সাহসী ভূমিকার কথাও আছে সেসব বিবরণে। কিন্তু অস্ত্র হাতে 'নারী'র সাহসী যোদ্ধারূপ এদের কারও চোখে পড়েনি। তবে ব্যতিক্রমও আছে :

ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম বলেছেন :

> আওয়ামী লীগ নেতা ও এমপি ইমামউদ্দিনের (ফরিদপুর শহরে) বাড়িতে পা দিয়েই বুঝলাম লোকজন বেশ শঙ্কিত। ঢাকার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কথা শুনেই লোকজন রাতের বেলা শহর থেকে চলে যায়। ইমামউদ্দিনের স্ত্রী খুব সাহসী মহিলা। বাড়িতে তিনি একা। ইমামউদ্দিন বাড়িতে নেই, তিনি সংগ্রাম পরিষদের নেতা কর্মীদের নিয়ে আশেপাশের পুলিশ ও বিডিআর-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। স্ত্রীর কাছে খবর পেয়ে ইমাম সাহেব বাড়ি আসেন। তাড়াতাড়ি ডালভাত রান্না হলো।
>
> ... কুষ্টিয়াতে পাকসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। কুষ্টিয়ার সর্বশ্রেণীর লোক যুদ্ধে অংশ নেয়। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাত, ডাব, ডিম, রুটি, পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি পাঠায়।[১৫]

কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধে 'এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত' অংশ নেয়—এই বিবরণ থেকে বুঝতে পারি 'মেয়েদের যুদ্ধ করা' 'এমনকি' বিশেষণ লাগিয়ে এর ব্যতিক্রমী বিশেষত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এসবই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন।

সমাজে-পরিবারে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগের নারীর অবস্থান অব্যাহত ছিল মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরেও। শরণার্থী শিবিরে সাধারণ মানুষ স্ত্রী-সন্তানদের নিয়েই গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনপদে বাড়িতে বাড়িতে তরুণ-যুবক-প্রবীণ-প্রৌঢ় সব রাজনেতিক কর্মীদের-নেতাদের জীবন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। প্রকাশ্য রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল স্বল্প। রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত মহিলারা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। ব্যাপক পুরুষ ঘর ছাড়া হয়েছিলেন। ভাবা হয়েছিল নারীদের পাকসেনারা কিছু করবে না। কিন্তু পাকসেনারা নারীদের ওপর বর্বর নির্যাতন করেছে।

এরকম অবস্থার কথা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে 'পুরুষ প্রাধান্য' সমাজ, সরকার, রাজনৈতিক দল অস্বাভাবিক মনে করেনি। কিন্তু নারীসমাজের পুরোধা কবি সুফিয়া কামাল তীব্র ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিতে নারীর অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে অভিযোগ জানিয়েছেন

> বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর বহু কথা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের মায়েদের দানের পরিমাণ কোনদিন উল্লেখ হয়নি। আজকে মায়েরা তাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। মা-এর সাথে তার ভাই এবং সন্তানেরাও উপস্থিত।
>
> কত মা-এর, ভাই-এর, বোনের অন্তর ছেড়া ধন দিয়ে এই বাংলাদেশ হয়েছে। এই বুকে মা-এর দান কতটুকু। যে মা তার সন্তানকে যুদ্ধে ছেড়ে দেয়, সে মা জানে তার সন্তান নাও ফিরে আসতে পারে।
>
> আপনারা জানেন যুদ্ধের সময় ঢাকা শহর খালি হয়ে গিয়েছিল। পাকবাহিনীরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে। তখন সে রকম কোন লোক ছিল না যারা পাকিস্তানীদের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করবেন। মেয়েরা তাদের ভাইদের রক্ত দিয়েছেন এবং নিজের ইজ্জত দিয়েছেন। এই কথাটা আপনারা সব সময় স্মরণ রাখবেন। মায়েদের মর্যাদা সব সময় রাখবেন।[১৬]

অভিযোগের এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর সশস্ত্র প্রতিরোধে পুরুষ-যুবক-তরুণদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার কাজ হয়েছে সরকারি ও রাজনৈতিক উদ্যোগে। কিন্তু অবরুদ্ধ দেশে তাদেরই মা-বোন যখন একাকী যুদ্ধ করেছে তখন মুক্তিযোদ্ধারা কেউ পাশে থাকেনি। নারীদের মুক্তিযুদ্ধ করার অনেক বিবরণ ও তথ্য ১৯৯০ সালের পর থেকে পাওয়া যাচ্ছে। নারী আন্দোলন-সংগঠন থেকে মুক্তিযোদ্ধা নারীদের খুঁজে বের করা, সংবর্ধনা দেওয়া, লেখালেখি করা, বই বের করা—ইত্যাদি কাজের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের নারীদের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়েছে। ১৯৯৫ সালে সাংবাদিক অধ্যাপক বিমলকান্তি দে অনুসন্ধান করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ১৯৭২ সালে 'বীর প্রতীক' পদকপ্রাপ্ত অথচ ২৩ বছর ধরে অজ্ঞাত রয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা তারামন বেগম'কে। তিনি অস্ত্র হাতে অবরুদ্ধ দেশে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে থেকে যুদ্ধ করেছেন—এটা সম্ভবত অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে অথচ 'বীরপ্রতীক' পদক দিতে হয়েছে সরকারকে, কেননা সহযোদ্ধাদের তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারামন যুদ্ধ করেছেন। এরপরই তাকে অবলীলায় ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে জাতির, জনগণের ও সরকারের। কিন্তু ক্যাপ্টেন সিতারা ডাক্তারী ও সেবিকার (নার্সিং) কাজ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালে, তাছাড়া তিনি সেনাবাহিনীর ডাক্তার ছিলেন—কাজেই তাকে খুঁজে পাওয়া কষ্ট হয়নি এবং বীরপ্রতীক পদক দিয়ে তাকে ভুলেও যায়নি কেউ।

বেইজিং-চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত (১৯৯৫) দলিলে 'সশস্ত্র সংঘাত ও নারী' বিষয়ে বলা হয়েছে :

> বেসামরিক ক্ষতিগ্রস্তদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু, তাদের সংখ্যা প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত প্রতিপক্ষদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। উপরন্তু নারী প্রায়ই আহত যোদ্ধাদের শুশ্রূষাকারিণী হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা দেখে যে, সংঘর্ষের পরিণতিতে হঠাৎ করে তারা পরিবারের একমাত্র মালিক, মাতা-পিতা এবং বয়স্ক আত্মীয়স্বজনের একমাত্র পরিচর্যাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৭]

বিশ্বপ্রেক্ষাপটে এই অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়েছে যে, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার বৈষম্যমূলক সমাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য সশস্ত্র সংঘর্ষে নারীর এই যে গৎবাঁধা ভূমিকা হচ্ছে তা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে 'তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব স্তরে তাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।'[১৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত সনাতন ও পশ্চাৎপদ। এর বিরুদ্ধে নারীসমাজ সংগ্রামরত রয়েছেন বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসনামল থেকেই। স্বাধীনতার পরেও, ২০০০ সালেও নারীসমাজের সেই সংগ্রাম থেমে নেই। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মর্যাদার দিক থেকে অবস্থাগতভাবে নারীসমাজের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অবস্থানগত পরিবর্তন হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরুষ জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম যখন চলেছে পাকসেনাদের পরাস্ত করে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য তখন নারী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম চলেছে স্বদেশ মুক্তির সাথে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। এই বাস্তব বৈষম্যমূলক নারীর অবস্থান আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে একটি উদাহরণ দিচ্ছি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় অভিযুক্ত (১৯৭১-এর ২৬ মার্চ ভোর ৬ টায় শহীদ) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর স্ত্রী কোহিনূর হোসেন-এর স্মৃতি চারণ থেকে :

> ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হঠাৎই হয় ১৯৫৮ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি। আমরা কেউ কাউকে আগে দেখি নাই, জানি নাই। শা-নজরেই প্রথম দেখা। বিয়ের রাতে তাঁর প্রথম কথা আজও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন 'একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে পৃথিবীতে আমার বাবা, মা, ভাই, বোন সব থেকে প্রিয়। তারা খুশী হলেই আমাকে পাবে।' আমি বুঝলাম তিনি কি বলতে চাইছেন। এরপর আমার ১২ বছর বিবাহিত জীবনে সেই কথা কখনো ভুলি নাই এবং আমিও তাঁকে আপন করেই পেয়েছিলাম,—তিনিও তাঁর কথা রেখেছিলেন। তার ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম অফুরন্তভাবে। যা আজ আমার চলার পথের পাথেয়।[১৯]

সংগ্রামী, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক এবং স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। কিন্তু নারীর ভূমিকা পালনের সামাজিকীকরণ তাঁর মধ্যেও তীব্রভাবে কার্যকর ছিল এবং তাঁর স্ত্রীও তা গ্রহণ করেছেন একই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে। স্বামীর পরিবারের সকলের মনোরঞ্জন করেই নারীকে পেতে হয় স্ত্রীর মর্যাদা—এটাই বাংলাদেশের সমাজে কার্যকর ছিল এবং আছে। ফলে একাত্তরের পুরুষ এগিয়ে যান তার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে, নারী পড়ে থাকেন স্বামীর ভিটা আঁকড়ে, স্বামীর আত্মীয় পরিজন, সন্তানদের নিয়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে। নারী এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পরোক্ষ ভূমিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছে পুরুষ জনগোষ্ঠী।

মুক্তিযুদ্ধের ২৯ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতি পাচ্ছেন নারীরা। সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে, গবেষণা চলেছে। দীর্ঘ সময়ের অস্বীকৃতি, বিস্মৃতি ও অবহেলার পর ইতিহাস এখন বদলে যাচ্ছে : নারী পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা নয়, প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা রূপেই দেদীপ্য হয়ে উঠেছেন।

সূত্র

১. সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল্‌স্‌ ও অন্যান্য বাহিনী*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ১০৩
২. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর*। উদ্ধৃত রফিকুল ইসলামে সম্পাদিত, *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫
৩. ডা. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৮-১৩৯
৪. ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, প্রাগুক্ত, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত বই, পৃ. ১০১
৫. *মুক্তিযোদ্ধা নারীদের সম্বর্ধনা ও লোক সঙ্গীত উৎসব প্রতিবেদন*, ঢাকা, বাংলাদেশ নারীপ্রগতি সংঘ, ১৯৯৮, পৃ. ১৬
৬. ঐ
৭. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯১, পৃ. ৮৫-৮৭
৮. ঐ, পৃ. ৮০-৮১
৯. ঐ, পৃ. ৫৪-৫৬
১০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, অষ্টম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯-৪০
১১. ঐ, পৃ. ৫৩-৫৬
১২. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১
১৩. ঐ, পৃ. ৪৫-৫১
১৪. ঐ, পৃ. ৫১
১৫. ঐ. ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার*, (সংকলিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র পঞ্চদশ খণ্ড,), পৃ. ৮৩।
১৬. ঐ, পৃ. ৭৫
১৭. কবি সুফিয়া কামাল, *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা, প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ. ২২-২৩
১৮. *জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা*, অনুবাদ, মালেকা বেগম, ঢাকা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ১৯৯৭, পৃ. ১১২
১৯. ঐ, পৃ. ১১২
২০. রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), *স্মৃতি ১৯৭১, চতুর্থ খণ্ড*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ৯

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা যোদ্ধা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি নরনারী জনগণের জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ১ কোটি শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময়কালে স্বদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। সামরিক গেরিলা যুদ্ধ অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া এই ক্ষেত্রে সাফল্য হতে পারতো না। সাধারণ মানুষ যেমন হয়েছেন ট্রেনিং পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা, তেমনি দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের সকল কাজে সামরিক ট্রেনিং ছাড়াই সাহায্য করেছেন। এরা ছিলেন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধিকাংশ বইপত্রে সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি[১] পীড়াদায়ক। এই প্রেক্ষাপটে নারীসমাজের যুদ্ধকালীন সময়ের ভূমিকাও বিভিন্ন বইপত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু হঠাৎ একটি দুটি সূত্রে নারীসমাজের অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই অনুসন্ধান পর্বের কথাই বলবো।

সিরাজগঞ্জের মনিকা মতিন, টাঙ্গাইলের শুকরী বেগম, জামেলা বেগম, মাজেদা বেগম সহজ সরল ভাষায় বলেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল নারী। অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৪ লাখ নারী ছিল মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা খবর আদানপ্রদান করতো। রাডার যেমন ভিতর ও বাইরের শত্রুদের খবর দেয়, আমাদের নারীরা সেই ভূমিকায় কাজ করেছে। আর শিশুরা যেন এক একটা এন্টেনার মতো কাজ করেছে। তাদের কাজ ছিল যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দেশ স্বাধীন হয়েছে শুধু পুরুষের জন্য নয়। নারীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া, যারা মা বোনদের ফেলে রেখে মুক্তিযুদ্ধে গেছে তাদের সবকিছু সামলিয়ে রাখা—এসবই নারীরা করেছে।[২]

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মেয়েদের ভাবনা, সাহস, কর্মকাণ্ড বিষয়ে অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে নানা জনের লেখায়। সেসব থেকে উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা :

১. *সত্যেন সেন :* 'ছোট্ট মেয়ে মিলি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ছাত্র ইউনিয়নের সভা, মিছিল, শ্লোগানে যোগ দিত। ছাত্রী দলে প্যারেড করে আসছিল। বাসার বাধা পেলেও বাধা মানেনি। আমাকে সে বলতো এবারকার স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। এ বাড়ির (ঢাকার নারিন্দা) আর কোনো মেয়ে এমন ভাবতেও পারে না। ভাবার মত দুঃসাহস তাদের নেই। পশ্চাতপদ সমাজে বসেও মিলি নতুন যুগের আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাই তার এ দুঃসাহস। বারবার সে আমাকে প্রশ্ন করেছে, 'দাদা, ওরা তো আক্রমণ করেছে, আমরা কি এখনো প্রতিরোধ করবো না? কেমন করে প্রতিরোধ করবো? আমাদের হাতে যে অস্ত্র নেই?' একথার কোনো উত্তর নেই।'[৩]

২. *সত্যন সেন* 'স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে পলাতক অবস্থায় যে পরিবার ছিলাম সেখানে বৌমার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া বাঁচতেই পারতাম না। স্বাধীনতার পর নতুন অধ্যায়ে সেই বৌমাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, নিমক হারামী আর কাকে বলে।'[৪]

৩. *আবুল ফজল* 'বন্দুকধারী দুর্বৃত্তরা এক মহিলার বালা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেও পারেনি (মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম)। বয়স্কা বাঙালি মহিলার কাছে দুর্বৃত্তরা বোধকরি এতোখানি সাহস আশা করেনি। মনে হয় প্রতিরোধের নিজস্ব একটা মূল্য রয়েছে যা সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়।

আজ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবো যারা আমাদের এ বিজয়ের পথ রচনা করেছেন রক্ত দিয়ে অশ্রু দিয়ে, পুত্র দিয়ে, স্বামী দিয়ে, পিতা ভাইকে বলী দিয়ে—সেই সব অজ্ঞাতনামাদের। ইতিহাসে তারা উল্লেখিত হবেন না সত্য, কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালি কখনো ভুলবে না এ আত্মোৎসর্গের অমর স্মৃতি। গৌরবের সাথে মিশে আছে অসীম বেদনাও।'[৫]

৪. *সুফিয়া কামাল* 'বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মা-বোনেরা যুদ্ধ করেছেন। মা, বোন, ভাই, স্বামী একত্র হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। শুধু পুরুষরা নয়, শুধুমাত্র নারীরা নয়, যে মায়েরা বুকের সন্তানকে ছেড়ে দিয়েছেন তাদের কথা ভাবতে হবে। যে মায়েরা, বোনেরা, সন্তানরা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের নাম আমরা জানি না। যে মায়েরা সম্মুখযুদ্ধে গিয়েছিল তাদের নাম আমরা শুনতে পাই না।

মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন। তারা সংগ্রাম করেছেন। তারা সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন শত্রুকে। যুদ্ধের পর কেউ তাদের ডাকেনি। এটা তাদের দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়।'[৬]

৫. *সরদার ফজলুল করিম :* 'একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ তার অমোঘ উচ্চারিত দাবি, 'ইতিহাস কথা কয়', 'ইতিহাসকে কথা বলতে দাও।' কিন্তু সে দাবি পূরণে অনীহা ও অনিচ্ছা যেন ক্রমান্বয়ে দূরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোনো না কোনোভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে। বহু বীরত্ব গাঁথা বিশ্বাসঘাতকতা, ত্যাগ, অত্যাচার, নিপীড়ণের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন।'[৭]

৬. *বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা :* 'মুক্তিযুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ মানে মেয়েদের সাহস।'[৮]

৭. *রাবেয়া খাতুন :* 'মুক্তিযুদ্ধের মাস মার্চ ১৬ তে কবি সাহিত্যিক শিল্পী এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সে মিছিলে মহিলাদের সংখ্যা কম হলেও মিছিলের শুরু তাদের দিয়েই। একদিকে লায়লা সামাদ, আরেকদিকে কাজী রোজী, সুফিয়া কামাল ফেস্টুন হাতে। ফেস্টুনে লেখা বড় অক্ষরে অস্ত্রের ভাষায় অস্ত্র চলবে এসো সশস্ত্র অস্ত্রের পথ ধরি। সেই মিছিলে ছিলেন কবি মেহেরুন্নেসা, নতুন লেখক সুফিয়া খাতুন, অন্যান্য কবি, শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী।'[৯]

৮. *আনিসুজ্জামান* 'রাজনৈতিক, ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি মহিলা সমাবেশ মিছিলে যুক্ত হলো চট্টগ্রাম বান্ধবী সংঘ, মহিলা পরিষদ, মহিলা আওয়ামী লীগ। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ '৭১-এ বড় বড় সমাবেশ হলো।'[১০]

৯. *এম আর আখতার মুকুল* 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীসমাজের অবদানের মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। অথচ বাস্তবে তাদের সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহবধূরা যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আশ্রয় দান করেছিলেন, এমন কি অনেক সময় নিজেদের আহার পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দান করেছিলেন সে সব ঘটনা অন্তত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ থাকার কথা। মুক্তিযুদ্ধের দুঃসাহসিক সৈনিকদের পাশাপাশি সেদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।'[১১]

১০. *সেলিনা হোসেন :* 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্য মেয়েরা দিয়েছে চরমভাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে ডোমদের বিবরণ পড়লে গা শিউড়ে ওঠে ঘৃণায়, ক্রোধ জন্মায়। যেকোনো দেশে যে কোনকালে এ কথা সত্য যে, রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সামাজিক দায়ভার এভাবেই বহন করতে হয় নারীদের। প্রাকৃতিক কারণেই একে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ মূল্যদান যে কোনো বড় অর্জনের অংশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এ দেশের নারীরা আরো অনেক ধরনের ত্যাগের বাইরেও স্বাধীনতার মতো বড় অর্জনের মধ্যে নিজেদের এভাবেই যুক্ত করেছে। কোনো বিচারেই এ ত্যাগের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যে যুবক চোখ এবং হাত বাঁধা অবস্থায় নিহত হয় এবং যে যুবতী লোহার শিকে ঝুলে মৃত্যুবরণ করে তাতে কোনো তফাৎ নেই। কারণ একই-স্বাধীনতা।'[১২]

এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিবরণে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

কবি সুফিয়া কামাল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সারাদেশের নারীসমাজকে মুক্তিযুদ্ধে বলীয়ান হয়ে অংশগ্রহণ করার কাজে। তাঁর '৭১-এর ডায়রিতে জানুয়ারি থেকে নারীসমাজের যুদ্ধ মোকাবিলার প্রস্তুতির তথ্য রয়েছে।

মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কবি সুফিয়া কামাল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকায় তাঁর বাসগৃহে ছিলেন। তাঁর বাড়ির ওপর এবং গতিবিধির ওপর ছিল পাকবানিহীর কড়া নজর। তাঁর জীবন সংশয় বিষয়ে বিদেশের প্রচার মাধ্যমে খবর প্রচারিত হওয়ায় পাকবাহিনী জোরপূর্বক তাঁকে দিয়ে ঢাকা বেতার থেকে প্রচার করায় যে তিনি বেঁচে

আছেন।[১৩] এ রকম বহু অত্যাচার-পীড়ন-সংকট তাঁর ও পরিবারের সকলের ওপর চলেছে। তিনি ওই অবস্থাতেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন বহু পরিচিত মহিলা ও পুরুষদের সহযোগিতায়।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সে সময় আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন অবস্থায় পাক আর্মির দ্বারা বন্দি হয়ে ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ ছিলেন। বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভাইবোন সহ মায়ের সঙ্গে অবরুদ্ধ ছিলেন ধানমণ্ডির ১৮ নং রোডের একটি বাড়িতে। স্বাধীনতার পর ১৭ ডিসেম্বর তাঁরা মুক্তি পেলেন।[১৫]

সে গিয়েছে এক ভয়, সন্ত্রাস ও অত্যাচারের যুগ। শরণার্থী শিবিরের জীবনযাপন সহজ সাবলীল ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের বছর জুড়ে নারীর জীবনে নেমে এসেছিল অবাঞ্ছিত অত্যাচার, নিপীড়ন, সন্তানের মৃত্যু, শিশুর অপুষ্টি, বিবাহযোগ্য মেয়ের নিরাপত্তার অভাব, স্বামী-সন্তানের নিরাপত্তার অভাব, বউ-ঝির নিরাপত্তার অভাব। এসব বহু অসহনীয় নির্যাতনের মধ্যেও নারীসমাজ অকুতোভয়ে ভূমিকা রেখেছেন নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার মত।[১৬]

এই সব তথ্য ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মহিলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি পুস্তিকা। পরাধীন দেশে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের নারীসমাজের ওপর পাক-জান্তার বর্বর পাশবিকতার বিষয়ে 'টু দি কনসায়েন্স অব পিপল' শিরোনামে প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে যা লেখা আছে বাস্তবে তার চাইতেও বেশি নির্মম সহিংসতার শিকার হয়েছে এদেশের মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধা নারীসমাজ।[১৭]

ভারতের নারী ফেডারেশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম এবং রাজনৈতিক নেত্রী মতিয়া চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ ও পাকবাহিনীর গণহত্যা, নারীনির্যাতন, পাশবিকতা, স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে সারা ভারতবর্ষে প্রচার আন্দোলন চালিয়েছেন। সংগঠিত উদ্যোগে এই কাজের ব্যাপক শুভ প্রভাব পড়েছে ভারতীয় নারীসমাজের মধ্যে। তারা সংহতি জানান। প্রচার করেন ভারতে এবং বিশ্ববাসীর বিবেক জাগ্রত করার জন্য, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। ভারতীয় নারী ফেডারেশনের নেত্রীবৃন্দ যথা, অরুণা আসফ আলী, রেণু চক্রবর্তী, বিমলা ফারুকী, গীতামুখার্জী, বাণী দাশগুপ্ত, ইলামিত্র, কল্পনা দত্ত (যোশী), বিদ্যামুন্সী, নিবেদিতা নাগ সহ বহু নারী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সেমিনার, সভা, প্রচার কাজ করেন। তাদের আহ্বানে বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের (ডব্লু আইডিএফ) নেত্রী ফ্রিডা ব্রাউন দিল্লিতে আসেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সংগঠন মহিলা পরিষদকে সমর্থন জানান। দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাসের সামনে পাক বর্বরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অনশনরত অস্ট্রেলীয় জনগণের সঙ্গে জুলাই, ১৯৭১-এ বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের নেত্রী ফ্রিডা ব্রাউন, বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম অনশনে যোগ দেন।[১৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ইন্ডিয়া এ্যাসোশিয়েশন হলে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের উদ্যোগে ১ এপ্রিল '৭১ মহিলাদের সভা হয়।[১৯] ১৭ এপ্রিল ভারতীয় ফেডারেশন বিবৃতি দেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে।[২০]

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির সঙ্গে মহিলা পরিষদের যৌথ সভা হয় বনগাঁওতে ১৭ জুন।

বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ ১২ জুলাই '৭১ এ এক বিবৃতি দিয়ে বিশ্বের নারীসমাজের প্রতি আকুল আবেদনে জানান 'বাংলার নারীদের বাঁচান।'[২১]

মহিলা পরিষদ ৪ অক্টোবর আবেদন জানায় রাষ্ট্র সংঘের (জাতিসংঘ) প্রতি 'বাংলাদেশের নারীদের ওপর পাক ফৌজের অত্যাচার বিষয়ে 'তদন্ত কমিটি' গঠনের জন্য।[২২] একই সময়ে সোভিয়েত নারী কমিটির কাছে আবেদন পাঠালে সোভিয়েত নারী কমিটি বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জানায় পাকবাহিনীর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে।[২৩]

ভারতে গোবরা ক্যাম্প পরিচালনার বিষয়ে বলতে গিয়ে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেছেন যে, ডা. লাল, ডা. ঘোষ, মীরা দে, ফুলরেণু গুহ, প্রতিভাবসু প্রমুখ নিয়মিত সহযোগিতা করেছেন। ভারতীয় জনগণ, নারী সমাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এভাবেই হয়েছিলেন সহযোদ্ধা।

এপ্রিলের শেষের দিকে ঢাকায় প্রতিরোধের ভিত্তিগুলো গড়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন, অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ অনেকের চেষ্টায় একটি গ্রুপ হলো যাদের মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সাহায্য করা। বেবী মওদুদ সাহায্য করতেন এসব কাজে।[২৪] কবি সুফিয়া কামাল সাহায্য করতেন নানাভাবে। তাঁর এলাকার যারা অন্যত্র চলে যান তারা তাঁকে দিয়ে যান তাদের রেশন-কার্ডগুলো। সুফিয়া কামাল সে সব কার্ড দিয়ে চাল আটা চিনি তেল তুলে রাখতেন। অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ প্রায় সময় রিকশাওয়ালার বেশে পিছন দেয়াল দিয়ে টপকে লোকচক্ষু এড়িয়ে সেইসব খাদ্য নিয়ে যেতেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।[২৫]

'৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকার সেক্টর-২ এর মুক্তিযোদ্ধাদের কতকগুলো পরিবারের মেয়েরা ঢাকার ভিতরে নানা কাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। একটি পরিবারের তিন বোন আসমা, রেশমা ও সায়মার লেখা থেকে জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঢাকায় আসতো তাদের স্টেনগান, এক্সপ্লোসিভ ও গ্রেনেডগুলো গোপনে সংরক্ষণ করতো তারা তিন বোন। অপারেশনে যাওয়ার মুহূর্তে সেগুলো মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের হাতে তুলে দিতো ওরা। মুক্তিযোদ্ধা আলম, শাহাদাৎ চৌধুরী, ফতেহ্ আলী, জিয়া প্রমুখ ঠিক করলো মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি বিষয়ে ঢাকাবাসীদের জানাবেন তারা। সে জন্য ১৪ আগস্ট ১৯৭১-এ বাংলাদেশের পতাকা ওড়াবার কর্মসূচি নেয়া হয়। তিন বোন সেই অনুসারে জুলাই-এর ২১ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ২০০ পতাকা সেলাই করে। ছোটবড় সাইজের ছিল পতাকাগুলো। একসঙ্গে এতো কাপড় কিনতে গেলে সন্দেহ যদি হয় তাই সবুজ লুঙ্গি কিনে সঙ্গে হলুদ, লাল কাপড় ভিন্ন ভিন্নভাবে কিনে পতাকা তৈরি করা হলো। জমে গেলো বহু গোল সবুজ কাপড়ের টুকরো। আসমাদের মা সেই কাপড়ের পাশে পাশে ক্রুশকাটার কাজ করে টেবিলম্যাট বানিয়ে আত্মীয়দের বাসায় উপহার দেন ১৪ আগস্ট ঢাকা শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ [illegible] [illegible] এই সব পতাকা ওড়ানো হয় গ্যাস বেলুনের সাহায্যে। আজিমপুর,

তোপখানা রোড, স্টেডিয়াম থেকে পতাকা ওড়ানো হয়েছিল গ্যাস বেলুনের সাহায্যে। গাড়ি করে গিয়ে তিন বোন পতাকাগুলো উড়িয়ে আসে। ঢাকা শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখে পাকসেনারা ক্রোধে দিশাহারা হয়ে যায়। জনগণ আশান্বিত হয়। এই ধরনের কাজে নারীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[২৬]

চট্টগ্রামে 'মহিলা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গড়ে তুলেছিলেন ডাক্তার নূরুন্নাহার জহুর। দেশের ভিতরে এ রকম সংগঠিত কাজের ক্ষেত্রে ছিল প্রচণ্ড সমস্যা, ভয়। তবে যুদ্ধ ও পরিস্থিতির জন্য যে যেখানেই থাক না কেন বীর প্রীতিলতার উত্তরসূরী চট্টগ্রামের নারীরা প্রাণের ভয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকেনি কোথাও। অন্যতম সক্রিয় কর্মী মুশতারী শফী চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নারীদের বিস্তারিত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করেছেন তার 'মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী' গ্রন্থে।[২৭]

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেত্রী ডাক্তার নূরুন্নাহার ১০ জন ছাত্রী ও মহিলা কর্মীদের সংগঠিত করে সশস্ত্র ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন। নিজেও ট্রেনিং নেন। আনোয়ারা থানার বড় উঠান গ্রামে, পটিয়ার কাশেমপুর গ্রামে, সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে যেখানেই যেতে হয়েছে পরিস্থিতির জন্য সেখানেই তিনি নারীদের সংগঠিত করে, সাহস বাড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে আগস্ট পর্যন্ত কাজ করেছেন। এরপর ভারতে যান এবং আগরতলা জেভি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের ওয়ার্ডে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে ওষুধ দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কাজ করেন, বেতারে কথিকা প্রচার করেন, শরণার্থী ক্যাম্পে প্রসূতি ও শিশুদের চিকিৎসা ও রিলিফ কাজেও অংশ নেন।

উমরতুল ফজল, মুশতারী শফী, সীমা চক্রবর্তী, চিত্রা বিশ্বাস, প্রান্তিক চক্রবর্তী, হান্নানা বেগম, দিল আফরোজ, হাসিনা বেগম, ফরিদা আক্তার প্রমুখ মহিলা পরিষদের নেত্রী-কর্মীরা অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে বহু কাজ করে গেছেন। ঢাকা থেকে মহিলা পরিষদ নেত্রী কবি সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম চট্টগ্রামে গিয়ে ১৮-২২ মার্চ যে সভা মিছিল করেন নারীসমাজকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্য, সেই মিছিলের ছবি সামরিক বাহিনীর সংগ্রহে চলে যায়।

ডা. শফী ও মুশতারী শফীকে তার বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র রাখার দায়ে যখন আর্মির মেজর জেরা করছিলেন মার্চ মাসের শেষে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওযার পরপর, তখন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে মুশতারী শফীকে চিহ্নিত করেন একটি মিছিলের ছবি দেখিয়ে যেটি ছিল ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত মহিলা পরিষদের মিছিলের ছবি। মুশতারী শফীর স্বামী ডা. শফীকে পাক আর্মির একজন মেজর ধরে নিয়ে যাওয়ার পর মুশতারী শফী নানা গ্রামেগঞ্জে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আত্মগোপনে থেকে ২৬ মে ভারতে যান এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

চট্টগ্রামের স্টেশন রোডের রেলওয়ে ট্রেজারী ভেঙ্গে ২৬ মার্চ সকলেই বন্দুক নিয়ে যায়। বিভিন্ন বাসায় বন্দুক রাখা হয় গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য। এই কাজ বহু মেয়ে করেছে এবং বিপদে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ছিল রাজাকার, সংবাদদাতা। সীমা চক্রবর্তীদের বাসায় অস্ত্র রাখার দায়ে ওর বাবাকে হত্যা করে

মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চট্টগ্রামের মুসলিম হিন্দু পরিবারের ওপর ওরা চালিয়েছে নির্মম নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে ছেলে, স্বামী; সেই অভিযোগে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে মেয়েদের। নির্যাতনের অসম্মান থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যা করেছেন মেয়েরা। মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজের অনেক নার্স, লেডি ডাক্তার, ছাত্রী অবদান রেখেছেন।

গ্রামে গ্রামে গৃহবধূ, কৃষাণী মেয়েরা অসীম সাহসে লড়াই করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ছেলেরা চলে যাওয়ার পর মহিলারা দা-বটি, কুড়াল, কোদাল, কাস্তে হাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে চারদিকে। যখনি সন্দেহজনক রাজাকার দেখেছে তখনি এই সব অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে ঘায়েল করেছে। দলবেঁধে এ রকমভাবে মেয়েরা কাজ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় গ্রামেগঞ্জে শহরে মেয়েরা গ্রেনেড ছোঁড়া শিখেছে। কোনো এক গ্রামে আক্রমণ হলে সতর্ক হয় পাশের গ্রামের মেয়েরা। নন্দরখিল গ্রামে পাকসেনাদের ছাউনি গড়ে উঠলে মুক্তিযোদ্ধারা মেয়েদের হাতে গ্রেনেড দিয়ে যায়। সাহসী কিছু মেয়ে গ্রেনেড ছোঁড়া শিখে নেয়। গ্রেনেড চার্জে ১৭ জন পাকসেনা সেই গ্রামে মারা যায়।[২৮]

ডা. শামসুন্নাহার কামাল চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন পুরো সময়। সে সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন, চিকিৎসা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন এবং জীবন রক্ষা করেছেন।

ডা. রেনুকণা বড়ুয়া ছিলেন রেলওয়ে হাসপাতালের সহকারী সার্জন। তাঁর স্বামীকে পাক সেনারা হত্যা করার পর তিনি রাউজানের আবুরখানি গ্রামে চলে যান। যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে গ্রামে আসতেন গেরিলা যুদ্ধের জন্য। তখন তাদেরকে বিভিন্ন বাড়িতে ভাগাভাগি করে আশ্রয় দেয়ার যাবতীয় কাজে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে তখন চুলায় গরমপানি ও মরিচের গুড়া তৈরি হচ্ছিল। সর্বক্ষণ দাও বটি এসব নিয়ে মেয়েরা চলাফেরা করেছে। গ্রামের মেয়েরা একেকজন যেন সৈনিক হয়ে উঠলো। মেয়েরা নার্সিং ও অস্ত্র ট্রেনিং পেলো। মুক্তিযোদ্ধা আহত, অসুস্থ হলে মেয়েরা পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতো।[২৯]

আতিমা মওলা শুটার ছিলেন (৫১ সালের জাতীয় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)। স্বামীও রাইফেল শুটার ছিলেন। উভয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরুষ ও মহিলাদের, ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। ৫-১০ জন করে ২০ জন মেয়েকে ট্রেনিং দিলেন। অনেকে ভারতে চলে গেলেন। এরা গ্রামের মেয়েদের সংগঠিত করে ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের ও তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, সেবা করা, আহার-আশ্রয়ের গোপন আস্তানা ঠিক করে দেয়া ইত্যাদি অব্যাহত কাজ এরা করেছেন পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে। নেভাল আক্রমণের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নেয়ায় তাদের বাঁচাবার জন্য অবাঙালি নেভাল অফিসার লে. কমান্ডার মজিদ-এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তার সাহায্য গ্রহণ করা তথ্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই।

চট্টগ্রামের মেয়েরা কিভাবে গ্রামে গ্রামে কাজ করেছে, পাঠশালা চালিয়ে পড়াবার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্লাশ নিয়েছে সেসব বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া গেছে। কলমা গ্রামের মেয়েরা খেয়া পারাপারের কাজ করতো। মনোয়ারা, জাহানারা দুই বোন প্রতিরোধের ট্রেনিং দিয়েছে স্থানীয় লোকজনকে। বুড়ি এক ভিখারী ভিক্ষা করার ছল করে সেনাবাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের দিতো। ঘরের মেয়েদের যেন নিরাপদে সরিয়ে রাখা হয় এসব বিষয়েও বহুজন সহায়তা করেছে।

চট্টগ্রামের কলমা থেকে জাহানারা ও মনোয়ারা শিবরামপুর গ্রামে গিয়েছিল। ১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখ শিবরামপুরের বারৈখালী বাজার থেকে সামান্য দূরে একটি মাঠে বিকেল বেলায় কৃষক সম্মেলন ও জনসভা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির মুক্তিযোদ্ধারা কমরেড মনিসিংহের নেতৃত্বে এই সম্মেলন করে। সেই সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়েছিল 'মুক্তাঞ্চল কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন।' এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল জাহানারা, মনোয়ারাসহ মেয়েরা। মুক্তিযুদ্ধের শহরের মেয়েরা গ্রামে চলে যায় এবং শুধু মেয়েদের সংগঠিত করা নয়, পুরো গ্রামের মানুষদের তারা সাহসী করে তোলেন। জাহানারা আঙ্গুর ছিলেন তাদেরই একজন। মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করে পাঠানো, খবর সংগ্রহ ও দেওয়া এবং মেয়েদের সংগঠিত করার কাজ করেছেন মেয়েরা।[৩০]

বরিশালের ঝালকাঠিতে একটি লঞ্চে পাকিস্তানী আর্মির দলবল যখন পৌঁছায় তখন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কবির ৩০ জনের একটি দল গঠন করে পাকবাহিনীকে ঘেরাও করেন। সে দলে মেয়েরাও ছিল। বীথিকাসহ দুজন মেয়ে ঘণ্টা দুই/আড়াই মুক্তিযোদ্ধাদের দলে থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ লড়াই করে। এই গুলি বিনিময়ে ১০/১২ জন পাকসেনা মারা যায় এবং অন্যেরা পালিয়ে যায়।[৩১]

মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার হেমায়েত বাহিনীতে ছিলেন ২৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নারী। তারা নিয়েছিলেন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা। গোয়েন্দা কাজের প্রশিক্ষণও এরা নিয়েছিলেন। ট্রেনিং শেষে তারা সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সেই মহিলাদের মধ্যথেকে অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। ফরিদপুরের কাটালি পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তারা। তারা একটি হাসপাতালও পরিচালনা করেন। মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলা যোদ্ধাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও চিকিৎসা করাতে আসতো।[৩২]

সেই হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের আক্রমণের শিকার একটি গ্রামের অধিবাসীদের বাঁচাতে এগিয়ে গেলে পাকবাহিনীরা পালিয়ে যায়। একটি মেয়েকে সেনারা অপহরণ করে নেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করে আনে। জানা যায় মেয়েটির পরিবার ভারতে শরণার্থী হয়ে চলে যায়, কিন্তু মেয়েটি দেশে থেকে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে এসে নানা কাজে যুক্ত হয়।[৩৩]

ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী আজমীরি ওয়ারেস সাহসের সঙ্গে অস্ত্র সরবরাহের কাজ করেছেন। সাভার-আরিচা থেকে একবার গাড়িতে গর্ভবতী মহিলা সেজে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা শহরে তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন একটি দল গড়ে উঠেছিল যারা দেশের ভিতরে পাকসেনাদের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে

লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন। এদের সঙ্গে মহিলা, ছাত্রীরাও কাজ করেছেন।[৩৪]

ঢাকা শহরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা কার্যকরী করতে মহিলা অভিভাকরা সহায়তা করেছেন। পাকবাহিনীর একটা প্রচারণা ছিল যে, ১৯৭১ সালের পরীক্ষা না দিলে সারা জীবনের জন্য পরীক্ষা দেওয়া থেকে বহিষ্কার করা হবে। স্বনামখ্যাত কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন এ বিষয়ে খোঁজ খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর চাচা হাফিজউদ্দিন সাহেব ছিলেন ধানমন্ডি বয়েজ হাইস্কুলের হেডমাস্টার। রাবেয়া খাতুন বহু সংকট পেরিয়ে তাঁর বাড়িতে যান এবং সঠিক খবর আনেন যে প্রচারিত খবরটি সত্য নয়। এরপর মায়েরা ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হলেন যে, চেনা জানা সকল পরিবারকে বিরত করা হবে যেন ছেলেমেয়েদের সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে না পাঠানো হয়। যারা পরীক্ষা দেবে তাদের উড়ো চিঠি পাঠানো হবে। বাঙালি ছেলে মেয়েরা কেউ সেবার পরীক্ষা দিতে যায়নি।[৩৫]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এসব কাজকে কি মুক্তিযুদ্ধ বলা যাবে? আসলে এও এক ধরনের মুক্তিযুদ্ধ। ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার অভাবের জন্য নয়, অধিকৃত পাক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার জন্য সেটাও ছিল এক ধরনের মুক্তিযুদ্ধ। ব্যাপক মহিলা এই কাজে যুক্ত ছিলেন। গণস্বাক্ষরতা অভিযানের বর্তমান পরিচালক মানবাধিকার-নারী আন্দোলনের নেত্রী রাশেদা কে চৌধুরীর সাক্ষাৎকারেও এ তথ্য পাওয়া যায়।[৩৬]

কবি সুফিয়া কামালের এক আত্মীয়া কবির বাসায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন, এই তথ্য জানিয়েছেন সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন। মীরপুরে বিহারী বাঙালি যুদ্ধ হয় মার্চ মাসের শুরুতেই। সংগ্রামী এক সম্ভাবনাময় মুক্তিযোদ্ধা কবি মেহেরুন্নেসা ২৫ মার্চ নিহত হন বিহারী সম্প্রদায়ের বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা বিরোধীদের হাতে। কবি কাজী রোজীর ওপরও আক্রমণ চালাতে আসে সংগঠিত এই রাজাকারের দল। তিনি তখন বেরিয়ে পড়েন শহরে। রাবেয়া খাতুন কবি সুফিয়া কামালের বাসায় গিয়ে জানতে পারেন কবির আত্মীয়ার বাসায় একজন মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নেয়ার পরপর পাক আর্মি রাজাকারের মারফত খবর পেয়ে সেখানে প্রবেশ করলে তিনি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বাচ্চাদের পড়ার টেবিলে মুক্তিযোদ্ধা তরুণটিকে বসিয়ে দেন প্রাইভেট টিউটির পরিচয়ে। সে যাত্রায় মুক্তিযোদ্ধাটি বেঁচে যান।[৩৭]

২৬ মার্চ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর শিরু মিয়া ঢাকায় ছিলেন। পাকবাহিনীর গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় তিনি এবং তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা ভাবেন। প্রবাসী সরকার তাদের ওপর দায়িত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার জন্য। তিনি রামকৃষ্ণপুরে নিজ গ্রামে নিজ ঘরটিকে ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। আনোয়ারা বোগম মুক্তিযোদ্ধাদের দেখাশোনা, খাবার রান্না করা, সেবা করার দায়িত্ব পালন করেন; নিকট আত্মীয়ের মতই শুধু নয়, একজন একনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার মতো। স্বামী শিরু মিয়া পরে রাজাকারের হাতে নিহত হন।[৩৮] এরকম বহু মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের মহিলারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

চারগাছার কাইতলা, বিটঘর, দরখার, রানীখার এইসব গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্ত পথের ধারে ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এই গ্রামগুলো দিয়ে সীমান্তপার হয়, দেশে ঢোকে, যুদ্ধ করে-এইসব অভিযোগে ১৫ সেপ্টেম্বর পাকসেনারা চারপাশ থেকে গ্রামগুলোকে ঘেরাও দেয়। গণহত্যা চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা যখন সীমান্ত পার হতো, ভিতরে আসতো এই সব এলাকার মহিলারা তাদেরকে খাবার দিয়ে, পিঠা নিয়ে, পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো অসীম দরদ ভালোবাসার সঙ্গে। এই গ্রামবাসী নারী-পুরুষদের পাকসেনারা আক্রমণ করেছে জেনে মুক্তিযোদ্ধারা চুপ থাকেননি। ৩০০/৩৫০ জন পাকসেনাকে মোকাবেলা করেন ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা। তারা শপথ নেন এই খুনীদের হাতে মা-বোনদের ছেড়ে যাবেন না। যুদ্ধ করে বিতাড়িত করেন তারা পাকসেনাদের। মুক্তিযোদ্ধারা এভাবেই মুক্তিযোদ্ধা মা বোনদের ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন।[৩৯]

দিনাজপুরের ঘুঘুডাঙ্গায় (বিলোনিয়া ফ্রন্টে) মুক্তিযোদ্ধারা শিবপুর ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণ করে। মুক্তিরা এগুতে থাকলে গ্রামবাসীরা যোগ দেন। এই প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধে গ্রামের নারীসমাজ যুক্ত ছিলেন। পাকসেনারা পালাতে বাধ্য হয়। এলাকা মুক্ত হয়।[৪০]

দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে, শরণার্থী ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের কাজ বলতে ছিল মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করা, সরকারি প্রশাসনিক কাজ করা, প্রচার করা, ট্রেনিং দেয়া, ট্রেনিং নেয়া, চাঁদা তোলা, ওষুধ, খাবার, কাপড় সংগ্রহ করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, প্রতিরোধ করা, যুদ্ধ করা, মনোবল তৈরি করা, সংগঠিত করা, প্রভৃতি বহুবিধ কাজ। এইসব কাজে দেশের ভিতরে ও বাইরে, প্রবাসে ও ভারতে, শহরে ও গ্রামে লক্ষ লক্ষ নারী অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা, মুক্তির গানের শিল্পীরা, গানের মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন দেশের ভিতরের উদ্বিগ্ন, পীড়িত, নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধা নারীপুরুষ জনগণকে।

ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাজ করেছেন নারীরা। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পে রান্না করার কাজ করেছেন যারা তারা অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরী হিসেবেও কাজ করেছেন। বীর প্রতীক হয়েছেন দুজন নারী; মুক্তিযোদ্ধা তারামন বেগম ও ক্যাপ্টেন সেতারা। ক্যাপ্টেন সেতারা বীরপ্রতীক সম্মানের পদক ১৯৭২ সালেই গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, জাতির এক অনুশোচনার-লজ্জার বিষয় যে, তারামন বেগম-কে ১৯৯৫ সালের আগে সরকার, সমাজ ও রাজনৈতিক দল এমনকি গবেষক, নারী আন্দোলনের সংগঠক—কেউই খোঁজ করিনি। অধ্যাপক বিমল কান্তি দে সংবাদপত্রে তুলে ধরেন তারামন বেগম-এর খবরা-খবর। তার গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আবিষ্কৃত খবরা-খবরে মিডিয়ার অনুসন্ধান (দৈনিক ভোরের কাগজ ১৯৯৫) চলে। তারামন বেগমের খোঁজখবর পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তারামন বেগমকে বীরপ্রতীক পদক দিলেন।

তারামন যেভাবে যুদ্ধ করেছেন সে বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো।[৪১] বাংলাবাজার পত্রিকার সাংবাদিক মিলান ফারাবী ১৯৯৬ সালের ১৩ জানুয়ারি লিখেছেন :

"একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধকালে রাজীবপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে তারামন বীরপ্রতীক রাঁধুনী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সদ্য কিশোরী। বয়স ১৪/১৫'র

বেশি ছিল না। কিন্তু তখন তার শরীরে শক্তিমত্তা ছিল অন্যরকম। গড়ন ছিল লম্বাটে। কোন ভারী কাজেও তাকে পিছপা হতে দেখা যায়নি। পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি সর্বদা অগ্রকদম ফেলে এগিয়েছেন। রাজীবপুর ওয়ারফিল্ডে এই কিশোরী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজ অম্লান বদনে করে যাচ্ছিল। একের পর এক এসাইনমেন্টে সে পাকিস্তানী সেনাদের অবস্থানস্থল কোদালকাঠি ইউনিয়নে ঢুকে যেতো। রাতের বেলা পাকসেনা শিবিরের কাছাকাছি ঢুঁ মেরে বের করে আনতো সব হাঁড়ির খবর। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই মুক্তিবাহিনী প্রথম পাকসেনা শিবিরে হামলা চালায়। এছাড়া ওই রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরুর আগে তারামন বিবি অসংখ্য বাঙালি পরিবারকে পাকবাহিনীর কবল থেকে নিরাপদ স্থানে আনার এসাইনমেন্টেও অংশ নেন।' প্রতিবেদকের কাছে এসব তথ্য জানিয়েছেন তারামনের সহযোদ্ধা রাজীবপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ মাস্টার, রাজীবপুর রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান সরকার প্রমুখ।

আব্দুল আজিজ মাস্টার তারামনের যুদ্ধে যাবার ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত খুলে বলেন প্রতিবেদকের কাছে। তিনি বলেন, 'মার্চের শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগে তারামন আমার বাড়িতে টুকটাক কাজ করতো। ওর বাবা আমাদের সম্পর্কে ভাই ছিলেন। তার অবর্তমানে পরিবারটির ছিল বড়ই দুরবস্থা। ভাবী মানে তারামনের মা কাজকাম ও ভিক্ষা করে সন্তান লালন পালন করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় পরিবারটির ওপর আরও কঠিন দুর্যোগ নেমে আসে। তখন আমাদের বাড়ি ছিল সদর রাজীবপুরের সোনাভরি নদীর কান্দায়। বর্তমানে সে বাড়ি ভেঙ্গে নদীতে চলে গেছে। নদীর এপারে ছিল আমাদের বাড়ি আর ওপারে ছিল তারামনদের বাড়ি।

এক সময় নদীর পশ্চিম পাড় দিয়ে হাজার হাজার মানুষ আসতে লাগলো। বগুড়া, শেরপুর, গাইবান্ধার লোক। পাকবাহিনীর হামলার মুখে সবাই 'দুর্যোগী' মানুষ। পাড়ি জমাতে লাগলো ভারতে। কেউ আশ্রয় নিলো রাজীবপুর স্কুলে। এক পর্যায়ে পাকবাহিনী সোনাভরির ওপারের কোদালকাঠি এসে ক্যাম্প বসায়। আমি তখন ভীত হয়ে পরিবারকে রৌমারির বিক্রিবিল পাঠিয়ে দেই। আমার ভাই তার পরিবার পাঠায়নি।

জুন মাসে রাজীবপুরে আমার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প বসে। মনসুর হাবিলদার, আলতাফ সুবাদার, মুহিব হাবিলদার ক্যাম্প করলেন। আমিও ক্যাম্পে ইনক্লুড হলাম। আলতাফ সুবাদার পলাশবাড়ি থেকে একটা দল নিয়ে পাথরের চর দিয়ে ইন্ডিয়া ঢোকেন। তারপর রাজীবপুর এসে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গড়ে তোলেন। আমাদের মধ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, আর্মি এবং ইপিআরের নওজোয়ানরা ছিল। সাভাবিকভাবেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল বেশি। এদেরকে কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করে দেয়া হল। প্রতিটি প্লাটুনে ২/৩ জন করে পেশাদার আর্মি যুক্ত করা হল। কথা ছিল, এরা আমাদের অস্ত্র চালনায় আরও পারদর্শী করে তুলবে। সিলেট নিবাসী মুহিব হাবিলদার আমাদের প্লাটুনে ওস্তাদের দায়িত্ব নিলেন। আমি ১৯৬৪ সাল থেকে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত। মুহিব ওস্তাদ আমাকে তাই মাস্টার বলে ডাকতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং সুশৃঙ্খল লোক ছিলেন। ১৫/২০ দিন ধরে ট্রেনিং চললো।

একদিন মুহিব হাবিলদার আমাকে বললেন, মাস্টার রান্নাবান্না করে খাইতে বড় অসুবিধা হচ্ছে। ক্যাম্পে ভালো পাকশাক হচ্ছে না। আপনার কাছে রান্নাবান্নায় ভালো কোন 'মেইয়ে'র খোঁজ আছে নাকি?

আমার তখন তারামনের কথা মনে পড়লো। বললাম, 'মেইয়ে' তো একটা আছে। আমার বাড়িতেই ছিল। আসলেই হয়। তো, এই ক্যাম্পের লাইফে 'মেইয়ে' ঢোকানো কি ঠিক হবে? মুহিব ওস্তাদ বললেন, না, অসুবিধা নাই। ক্যাম্পে দিনের বেলা পাকশাক করবে। তরিতরকারি কুটবো। কাপড় চোপড় ধুইবো। আর রাতের বেলা আপনার ভাইয়ের বাড়িতে থাকবে। আমি তারামনকে গিয়ে নিয়ে আসলাম। সে রান্নার কাজ করতে লাগলো। আর রাতের বেলা আমার ভাই তালেব আলীর ফ্যামিলিতে থাকতো। পাশেই তার বাড়ি; আমরা একই আঙিনা দুভাগ করে নিয়েছিলাম। কয়েকদিন পরপর ভাবী (তারামনের মা) আসতো। 'মেইয়ে'কে দেখে যেতো।

মুহিব হাবিলদারের সাথে তারামনের মার কথা হয়েছে। ভাবী বলেছেন, আপনি যে আমার কন্যাটারে ক্যাম্পে আনলেন কি কন্ডিশনে আনলেন। 'মেইয়ে'টার বিয়া দেয়া লাগবো, সেই দায়িত্ব কে নিবো? মুহিব হাবিলদার তখন বলেছেন, বুজি, আমারও ছেলেমেয়ে আছে। এই মাইয়ার আমিই দায়িত্ব নিবো। ওই সময় এক ঘটনা ঘটে যায়। আব্দুল হাই নামে এক লোকসহ আরও কয়েকজন ক্যাম্পের রান্নাবান্নার কাজ করতো। তারা প্রথম প্রথম তারামনের সাথে ঠাট্টা তামাশা করতো। আর ক্যাম্পের রান্নাতো বিরাট এক যজ্ঞ। আশপাশের গ্রামবাসী সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতো। চাল, ডাল, কুমড়া, লাউ এমনকি তারা গরুটা, বকরিটা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিতো। একদিন হাই নামের ওই লোক রাঁধুনী তারামনের প্রতি বাজে একটা 'টোন' করে। এ কথা মুহিব হাবিলদারের কানে যেতেই তিনি প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি সবাইকে ডেকে ঘোষণা দেন, তারামন আমার কন্যা। ধর্মবাপ হিসেবে আমি এই কন্যার দায়-দায়িত্ব নিলাম। ফের যদি কেউ তাকে খারাপ কিছু বলে তবে বিষয়টা আমি আমার নিজের ইজ্জতের ওপর নিমু। এরপর থেকে তারামন মহিব ওস্তাদকে বাপ ডাকতে থাকে। তাদের মধ্যে অকৃত্রিম বাপ-কন্যার সম্পর্ক তৈরি হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে মেয়ের যোগ দেয়া প্রসঙ্গে তারামন বীর প্রতীকের মা কুলসুম বিবি প্রতিবেদকের কাছে বলেন, আজিজ মাস্টার আমারে আইয়া কইলো, ভাবীজি, মুহিব হাবিলদার আপনার মেইয়েডারে পছন্দ করছে। সে তারামনের ইজ্জত সম্মানের সাথে ক্যাম্পের কাজে লাগাইতে চায়। আমি বড় দুঃখিত মানুষ। দিমু কি দিমু না, ভাবতেছি। আজিজ মাস্টার আমার স্বামীর সম্পর্কে ভাই লাগে। তারে অবিশ্বাস করতে পারি না। সে সময় আমি দশ বাড়ি 'বেড়াইয়া' (ভিক্ষা করে) খাই। খালা হাউড়ির (শাশুড়ি)র বাড়িতে থাকি। খালা হাউড়িও কইলো, মাস্টার হাবিলদারে যখন চাইতেছে, 'মেইয়ে'ডারে দাও। তারা মান-সম্মানের সাথেই রাখবো। তো মেয়ে ক্যাম্পে ফাইফরমাশ খাটছে। রান্নাবান্না করছে। মুহিব হাবিলদার তারামনকে দিয়া অন্য কাজ করাইছে কিনা আমি জানি না। হেউডা জানে আজিজ মাস্টার, সোলায়মান মাস্টার। তাদের কাছে যান। আজিজ মাস্টার, প্রতিবেদককে খুলে বলেন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ।

তারা জানান, ওই সময় তারামন রান্নার পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিও প্রবল আগ্রহ দেখাতে থাকে। প্রথমে মার্ক ফোর, থ্রি নট থ্রি রাইফেল পরিষ্কার করতো। আমরা কিভাবে কি করি, সবকিছু দেখতো, জানতে চাইতো। ধর্মবাপকেও জ্বালাতন করতো। আস্তে আস্তে সেও অস্ত্র চালনা শিখে যায়।

ক্যাম্প ছিল আমার বাড়িতে। এছাড়াও বদরেরপুর, মদনেরপুর, দশঘড়িয়া পাড়া, চকনেওয়াজী, পশ্চিম রাজীবপুরে একটু দূরে দূরে প্লাটুন বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে ভাগ ভাগ করে। ওপারে খাঁড়ভাঁজ, জুনিয়র স্কুলে পাকবাহিনী শেল্টার নিলো। এপার থেকে ওদের গতিবিধি দেখা যেতে লাগলো। ওরা টহল দিতে দিতে নদীর কান্দায় এসে দাঁড়াতো। আমাদেরকে দেখতে পেতো। তখনো আমরা ফায়ার ওপেন করিনি। একদিন আলতাফ সুবাদার বললেন, 'মাস্টার, পাকিস্তানিদের সাহসতো কম নয়। শালারা নদীর কান্দায় এসে ঘুর ঘুর করে। ওদেরকে দেখে নিতে হবে। ওদের চারদিকে ঘেরাও করে সব কটাকে এ্যামবুশ করে মারবো। একটাকেও পার হতে দেবো না।'

নদীর দুপারে পক্ষ-বিপক্ষ সৈন্য থাকায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে তা বাড়তে থাকে। এদিকে আমাদের জন্যে একটা মুশকিল দেখা দেয়। পাক সৈন্য ঘাঁটির পাশাপাশি গ্রামগুলোতে প্রায় দেড়/দু'শ নিরীহ পরিবার বাস করে যাচ্ছিল। তারা পালিয়ে আসেনি। আমরা এদিক থেকে পাকবাহিনীর দিকে ফায়ার ওপেন করলে ওসব গ্রামেও গুলি ছুটে যাবে। এছাড়া শত্রুর নাগালে এতগুলো বাঙালি পরিবার রেখে আমরা যুদ্ধ শুরু করতে পারি না। তাই সর্বাগ্রে ওদেরকে সরিয়ে আনা দরকার। আলতাফ সুবাদার বললেন, এ কাজে এমন কাউকে পাঠাতে হবে যে ওই সব গ্রামবাসীকে বিষয়টির ভয়াবহতা বোঝাতে সক্ষম হবে। কাকে পাঠানো যায়? আমাদের পক্ষের মুরুব্বিরা ভাবছেন। নদীর ধারে পাকসেনারা হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়। ফলে এই এসাইনমেন্ট বেশ রিস্কি। ওপার থেকে পাকবাহিনী ইচ্ছে করলে আমাদের ওপর নজরদারি করতে পারে। পুরোপুরি পেশাদারী সেনাদল তারা। নিশ্চয়ই তাদের কাছে শক্তিশালী দূরবীন আছে। আমরা এরকম ভাবছি। এ সময় মুহিব হাবিলদার বললেন, তারামনরে পাঠানো যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হোক।

পাকবাহিনী খাঁড়ুভাঁজ, খড়িয়াডাংগা উত্তর এলাকা, ভেলামারি খালের পারে টহল দেয়। তারামন যদি যায়, এর ফাঁক গলিয়ে তাকে যেতে হবে। কেউ কেউ হেসে উড়িয়ে দিলো। ওর সাহসই হবে না। আলতাফ সুবাদার তারামনকে ডাকলেন। সব বৃত্তান্ত বলে জানতে চাইলেন, কিরে, ওই পারে যেতে পারবি। তারামন কোন দ্বিধা না করেই বললো, পারুম। যা কইবেন, তাই করুম। ওর মুখে ভয়ের ছিটেফোঁটাও দেখলাম না।

সন্ধ্যা ঘন হতে আমরা নৌকা পানিতে নামালাম। মতলেব আর্মি, দাউদকান্দির নুরুল আমিন আর্মিসহ কয়েকজন তারামনকে নিয়ে নদীটি কোণাকুণি পার হয়ে গেল। নামিয়ে দিয়ে আসলো ওপারে। ওদিন রাতেই তার ফিরে আসার কথা। আসলো না। সেপ্টেম্বরে বলতে গেলে তখন নদীর বাতাসে বারুদ উড়ছে। সামান্য ম্যাচকাঠি জ্বেলে দিলেই দাবানল দেখা দেবে। আমরা সবাই তারামনকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। পাক আর্মির হাতে

ধরা পড়লো কিনা। পরের রাতে সে আসলো। তার মিশন সাকসেসফুল। বেশ কিছু পরিবার সে রাতেই ওই এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে এলো। কিছু ফ্যামিলি তারপরও থেকে গেল। জানলাম, তারা ভিটা ছেড়ে কোনমতেই আসতে রাজি নয়। পাক আর্মি তখনো কোন গণহত্যা চালায়নি, তাই ওরা ভেবেছিল এরা খারাপ ব্যবহার করবে না।

এরপর তারামনকে দেওয়া হল আরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আর সেটা হল পাকবাহিনীর ডেরা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া। সোজা কথায় স্পাইং। তারামন এ কাজেও দ্বিধাহীনভাবে রাজি হল। আলতাফ সুবাদারের গোপন বুদ্ধি পরামর্শসহ বেশ কয়েকবার ওপারে গেল, কমপক্ষে ৫/৬ বার সব কাজেই তার উৎসাহ। কোন গাফিলতি নেই।

পাক বাহিনী সম্পর্কে স্পাই তারামনের বিস্তারিত খোঁজ-খবর পাবার পর রেজাউল, আলতাফ, তাহের, মুহিব হাবিলদার বৈঠক করলেন। সিদ্ধান্ত হল, ডিফেন্স ওপারে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে চ্যাংড়া (যুবক) মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে ভয় পেয়ে গেলাম। কেউ কেউ হটে গেল। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। কোমরভাঙ্গি থেকে চড়িয়াহাটি ও মোল্লারহাট পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫ মাইল এলাকায় যতো নৌকা ছিল সব আমরা ক্লোজ করলাম। এলাকায় যতো কলাগাছ ছিল সব কাটা হল। রাতে প্রথমে সব নৌকা কোণাকুণি নদীর ওপারে পাকবাহিনীর অবস্থান থেকে একটু দূরে রাখা হল যাতে সহসা ওদের নজরে না আসে। কলাগাছগুলো নৌকার পাশাপাশি বেঁধে রাখা হল। মিশন ব্যর্থ হলে প্রয়াজনে যাতে নৌকার বিকল্প হিসেবে আমরা কলাগাছ ধরে পালিয়ে আসতে পারি। পরে ওই রাতে, সবাই আমরা ওপারে জড়ো হলাম। তারামনও অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে ছিল। কখনোই সে পিছিয়ে পড়েনি।

খড়িয়াডাঙ্গা খালের পানি ছিল পশ্চিম দিকে। একটা পার শুকনো। আমরা রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনীর ফায়ার রেঞ্জের বাইরে ট্রেঞ্চ খুঁড়লাম। সারা গ্রামবাসী সাহায্য করলো আমাদের। অস্ত্রসহ শেল্টার নিলাম সেখানে। দারুণ টেনশনে প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে। দেখা গেল, পাক বাহিনী তাদের ঘাঁটিতে চুপচাপ। টহলও কেউ দিচ্ছে না। ওদের যুদ্ধকৌশল নিয়ে আমরা আলাপ করছি। অনেকে ধারণা করলেন, ওরা এ্যাকশনে নামবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুই রাত চলে গেল। একদিন শেষ রাতে প্লেন আসলো। ভেলামারি খালের ওই পারে বম্বিং হল। সাথে সাথে আচম্বিতেই পাকসেনারা ফায়ার ওপেন করলো। ওদের মধ্যে শব্দ উঠলো, ইয়া আলী, ইয়া আলী। আমরা তখন হতভম্ব। পাকিস্তানি সেনারা বিরামহীন ফায়ার করে চললো। আমাদের মধ্যে সুলেমান মাস্টার, রাজ্জাক এলএমজি দিয়ে ফায়ার শুরু করলো। এক সময় আমরা অনুভব করলাম, পাক সেনারা খালের যে পার দিয়ে ফায়ার করছে তার ওপর পার দিয়েও লাগাতার গুলি চলছে। এই পক্ষটি কারা, আমরা ঠিক অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলাম। দু'পক্ষের ক্রস ফায়ারের মদ্যে পড়ে আমরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। ভোর হবার আগেই সোনাভরির অন্য পারে আমাদের মুক্তাঞ্চলে ফিরে এলাম।

পরে জেনেছি, পাকবাহিনীর কৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ওদের একটা অংশ খড়িয়াডাঙার পানিকে মাঝখানে রেখে খালের ওপারে চলে গেছে। পরে নিজেরাই শেষ

রাত জুড়ে গুলি ছুঁড়েছে একে অপরের ওপর। আর মুক্তিবাহিনীর গুলি ওদের বিভ্রান্ত করেছে দারুণভাবে। এই ভুলের খেসারত পাকিস্তানিদের দিতে হয়েছে হাতেনাতে। তাদের 'ক্যাজুয়ালটি' ছিল অনেক। পর দিন খালের চড়ায় আনাচে-কানাচে পাক সেনাদের অনেক লাশ পড়েছিল।

(দ্রষ্টব্য : এই প্রতিবেদনটি ৭ জানুয়ারি ৯৬-এ গৃহীত আব্দুল আজিজ মাস্টারের সাক্ষাতকার, ৫ জানুয়ারি ৯৬-এ গৃহীত কুলসুম বিবি (তারামানের মা) এবং ৬ জানুয়ারি '৯৬-এ গৃহীত মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীর সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।)"

তারামন বেগমকে 'ভোরের কাগজ' (তৎকালীন সম্পাদক, মতিউর রহমান) তহবিল তুলে জমি কিনে দেয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। নানা স্তরের নারীসমাজ ও সংগঠন, তাকে সম্বর্ধনা দেয়। এসবই ১৯৯৬-এর ঘটনা।

১৯৯৭ সালে দৈনিক সংবাদের সুনামগঞ্জ প্রতিনিধির অনুসন্ধানে আমরা জানলাম মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবির কথা। 'নারী প্রগতি সংঘ' খবর জেনে তাঁর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।[৪২] সুনামগঞ্জের সীমান্ত অঞ্চলের খাসিয়া পরিবারের নারী কাঁকন বিবি নানা দুর্বিপাকে তালাকপ্রাপ্ত হন। পরে বিয়ে করেন পাঞ্জাবী সীমান্ত রক্ষী আব্দুল মজিদ খান-কে। সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার থানায় বোগলা ক্যাম্পে স্বামীর সাথে ছিলেন। স্বামী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। একা জীবন যাপনের কষ্টে স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়ে তিনি ধরা পড়েন পাকিস্তানীদের হাতে। মুক্তিবাহিনীর লোক মনে করে তিনি তাদের দ্বারা নির্যাতিত হন। পরে পরিচয় জেনে তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যায় সিলেটের আথালিয়া ক্যাম্পে। তাকে তখন পাকবাহিনীর পক্ষে মুক্তিবাহিনীর খোঁজ আনতে বলা হয়। পরিচয়পত্র দেয়া হয়। মুক্তিবাহিনীর কাছে তিনি সব বলেন। দেশপ্রেমিক কাঁকন বিবি মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ শুরু করেন। ৫নং সেক্টরে তিনি লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচর্যার কাজ শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি শহীদ কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও অস্ত্র সরবরাহ করা ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ৫ নং সেক্টরের এলাকায় ঢুকলে মুক্তিযোদ্ধারা জর্ডিয়া ব্রিজ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। কলাগাছের ভেলায় করে বোমা, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ বহন করে কাঁকন বিবি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করেন, জর্ডিয়া ব্রীজ ধ্বংসের কৃতিত্বে অংশ নেন। মহব্বতপুর, কান্দাগাঁও, বসরাই টেংরাটিলা, বেটিরগাঁও, নুরপুর, দোয়ারাবাজার, টেবলাই, সিলাইর পাড়, পূর্ব বাংলা—এসব প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি গোলাবারুদ বয়ে বেড়িয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। পাকবাহিনীর নারী নির্যাতন, হত্যা, পাশবিকতা দেখে তার বিরুদ্ধে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি পরিবারে স্থান পাননি। ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন কাটান। এলাকায় তিনি 'খাইস্যা মুক্তি বেটি' নামে পরিচিত। তাঁকে সরকার স্থায়ী বসবাসের জন্য ভিটে জমি দিয়েছেন ১৯৯৯ সালে। দৈনিক জনকণ্ঠ ১৯৯৯ সালে সংবর্ধনা ও নগদ ২৫ হাজার টাকা দেয় এবং নারীপ্রগতি সংঘ প্রতিমাসে ১০০০ টাকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রবাসী বাঙালি সংগঠন আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।

সম্প্রতি বহু মহিলা মুক্তিযোদ্ধার আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা। জনকণ্ঠ পত্রিকার প্রতিবেদক মোয়াজ্জেম হোসেন তাদের কথা লিখেছেন :[৪৩]

"অকুতোভয় দুই মহিলা মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড চার্জ করে উড়িয়ে দিলেন গানবোট

একাত্তরের ১১ জুলাই। বৃষ্টিভেজা রাত। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে যৈজ্ঞকাকার নৌকায় উঠলেন দুই তরুণী। বীথিকা বিশ্বাস এবং শিশির কণা। দু'জনেরই কোমরে বাঁধা হ্যান্ড গ্রেনেড। পাক আর্মি এসেছে স্বরূপকাঠিতে, বড় নদীতে নোঙ্গর ফেলেছে তাদের গানবোট। খবর চলে এলো মুক্তিবাহিনীর কাছে, ক্যাপ্টেন বেগ সিদ্ধান্ত নিলেন, গ্রেনেড চার্জ করতে হবে গানবোটে। কে যাবে? আগ্রহ দেখালেন দুই অকতোভয় তরুণী বীথিকা এবং শিশির কণা। এর আগেও কয়েকটি অপারেশনে সাফল্যের সঙ্গে লড়েছেন বীথিকা, তাই আপত্তি করলেন না ক্যাপ্টেন বেগ। চালাতে জানেন রাইফেল, গ্রেনেড ছোঁড়ার ট্রেনিং নেয়া আছে, কাজেই ভয় কি? তাছাড়া সিদ্ধান্ত তো নিয়েই ফেলেছেন, মরতে যখন হবেই তখন শত্রুবাহিনীকে মেরেই মরা ভাল।

নৌকা থেকে পানিতে নেমে সাঁতার দিয়ে গানবোটের দিকে এগিয়ে গেলেন দুই তরুণী। কচুরিপানার সঙ্গে মিশে অন্ধকারে ভেসে ভেসে গিয়ে ভিড়লেন লঞ্চের গায়ে। পাশাপাশি তিনটি লঞ্চ। বাতাসে রান্নার গন্ধ ভাসছে, লঞ্চের ভিতরে পাকবাহিনীর খানাপিনার আয়োজন। বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ করে আরও জোরে এলো। দুই তরুণীর বুক টিপ টিপ করছে। একেবারে চরম বিপদের মুখোমুখি, ধরা পড়লে রক্ষা নেই। শিশিরকণার কাঁধে চাপ দিলেন বীথিকা, এখনই সময়, আর দেরী করা যাবে না। দাঁতে গ্রেনেডের রিং কামড়ে ধরলেন বিথীকা, টান দিয়ে ছুড়ে মারলেন গ্রেনেড। শিশির কণার হাত থেকেও ছুটে গেল গ্রেনেড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকবাহিনীর গানবোট। আর মুহূর্তের মধ্যেই গানবোট থেকে দুই তীরের জমাট অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল শত রাউন্ড মেশিনগানের গুলি।

তারপর বীথিকা আর শিশির কণা জীবন্মৃত অবস্থায় অন্ধকারে লঞ্চের আড়ালে ভেসে ছিলেন। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন তেমন আশা ছিল না। অনেকক্ষণ পরে অন্ধকারে কচুরিপানার নিচ দিয়ে চোরা সাঁতার দিয়ে তীরে ফিরলেন। অন্ধকারে হেঁটে এক সময় পৌঁছে গেলেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। বীথিকা বিশ্বাসের বয়ানে সংক্ষেপে এই হচ্ছে অপারেশন স্বরূপকাঠির কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের এই অজানা যোদ্ধা তুলে ধরলেন মুক্তিযুদ্ধের সেই চাপা পড়া অধ্যায়, রণাঙ্গনে বাংলার নারীদের অবিশ্বাস্য সাহসিকতার নানা কাহিনী।

একাত্তরে পিরোজপুরের আটকুড়িয়ানা গ্রামে ঘটেছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। পুরো এলাকাটি ছিল হিন্দুপ্রধান, স্বাভাবিকভাবেই পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের প্রথম আক্রমণ শুরু হয়েছিল হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোতে। বীথিকা বিশ্বাস-কুড়িয়ানা গ্রামেরই বাসিন্দা। তখন তিনি কলেজের ছাত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) গ্রুপের কর্মী। ২৫ মার্চের পর ফিরে এসেছেন গ্রামে। বড় ভাই সমীরণের সঙ্গে দিনরাত সলাপরামর্শ করেছেন, কি

করা যায়। দু'ভাই-বোনে মিলে গ্রামে গোপনে মিটিং করে দল গড়লেন, সমীরণ পাশের গ্রামের পরিচিত বন্ধুদের থেকে ধার করে আনলেন দুটো রাইফেল। মে মাসে কুড়িয়ানায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি করলেন ক্যাপ্টেন মাহমুদ আলম বেগ। সাথে সাথে পেয়ারা বাগানে ঘাঁটিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন বেগের সঙ্গে দেখা করলেন বীথিকা বিশ্বাস। 'অবলা' বলে তাঁকে দলে নেয়া হচ্ছিল না। বীথিকা বললেন, মরতে হয় মেরে মরব, আমাকে দলে নতেই হবে। তাঁর দেখাদেখি এলেন শিশির কণা, শোভাসহ আরও অনেকে। সে এক অবাক করা ঘটনা। পিরোজপুরের এক অখ্যাত গ্রামের মেয়েগুলো ট্রেনিং পেয়ে হয়ে উঠল এক একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা। পিরোজপুরের বিভিন্ন এলাকায় পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি।

মুক্তিযুদ্ধের এমন এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় কিভাবে চাপা পড়েছিল এতদিন? তার কোন সদুত্তর নেই ৯ নম্বর সেক্টরের সে সময়ের কর্তাব্যক্তিদের মুখে। ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট ওবায়দুর রহমান মোস্তাফা সে সময় ছিলেন ৯ নম্বর সেক্টরের স্টাফ অফিসার। তিনি বললেন, দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল না বলে এতদিন তাঁরা এসব কথা বলেননি।

পিরোজপুরের কুড়িয়ানা গ্রামের মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন বেসরকারি সংস্থা ব্রতীর নির্বাহী পরিচালক শারমিন মুরশিদ। স্বামীর মুখে তিনি প্রথম শুনেছিলেন বিথীকা বিশ্বাসের নাম। বীথিকার সন্ধানে তিনি গিয়েছিলেন পিরোজপুরের গ্রামে। সেখানে গিয়ে জানা গেল বীথিকা বিশ্বাস ১৯৭৫-এ পাড়ি জমিয়েছেন ভারতে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বিয়ে করে সেখানেই স্থায়ী সংসার পেতেছেন। সেখান থেকে বীথিকাকে ঢাকা নিয়ে এসেছে 'ব্রতী'। শনিবার ধানমন্ডিতে ব্রতী'র অফিসে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন বীথিকা বিশ্বাস। সাথে ছিলেন রণাঙ্গনের সহযোদ্ধা বর্তমানে ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, ৯ নম্বর সেক্টরের মুলাদী এলাকার বেজ কমান্ডার কুতুবউদ্দীন, কুড়িগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা পরিমল ঘোষ, ৯ নম্বর সেক্টরের অন্যতম দলনেতা তোফাজ্জল হক।

এ্যাডভোকেট ওবায়দুর রহমান মোস্তফা জানান, পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহকুমার টাকীতে ৯ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল। সেখানেই তিনি প্রথম বীথিকার সাক্ষাত পান। বীথিকার দায়িত্ব ছিল গেরিলা এবং গুপ্তচর বৃত্তির ট্রেনিং দেয়ার জন্য মেয়েদের সংগ্রহ করে আনা। অনেক অভিভাবক একথা বললে মেয়েদের ছাড়তে চাইত না। এজন্য বলা হতো আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার জন্য মেয়েদের নার্সের ট্রেনিং দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১০০ মেয়েকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। এ্যাডভোকেট মোস্তফা বলেন, আমার জানামতে আর কোন সেক্টরে মেয়েদের এমন দল ছিল না। ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক অপারেশনে অংশ নেন বীথিকা বিশ্বাস।

'অপারেশন স্বরূপকাঠি'র আরেক দুঃসাহসী নারীযোদ্ধা শিশির কণা কোথায় আছেন? পিরোজপুরের গ্রামেই আছেন এখনও শিশির কণা, চাকরি করেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে।

কেবল বীথিকা বা শিশির কণা নয়, পিরোজপুরের সেই নিভৃত পল্লীর আরও অনেক দুঃসাহসী নারীযোদ্ধার কথা জানা গেল শনিবারের অনুষ্ঠানে। মুলাদীর বেজ কমান্ডার কুতুবউদ্দীন জানালেন মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগমের কথা। পাতার চর গ্রামের করুণা বেগমের স্বামীকে হত্যা করেছিল পাকবাহিনী। স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য করুণা বেগম ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করলেন কুতুবউদ্দীনের সঙ্গে। বললেন, তিনিও কাজ করতে চান মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। গৌরনদী থানার এক অপারেশনে কুতুবউদ্দীনের সঙ্গী হলেন করুণা বেগম। দু'জনে সেদিন ভিক্ষুক সেজেছিলেন। কুতুবউদ্দীন অন্ধ, লাঠি ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন করুণা বেগম। পথে পাকবাহিনীর ওপর গ্রেনেড ছুড়লেন কুতুবউদ্দীন, পাকবাহিনীর গুলিবর্ষণে আহত হলেন করুণা। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। কাঁধে করে আহত করুণাকে বয়ে এনেছিলেন কুতুবউদ্দীন। করুণা এখন মুলাদী থানার পাতার চর গ্রামে বাস করছেন।

কুড়িয়ানার নারীযোদ্ধারা গ্রেনেড ছুড়ে ডুবিয়ে দিয়েছেন পাকবাহিনীর লঞ্চ। প্রতিরোধ গড়েছেন রাজাকারদের হামলার বিরুদ্ধে। কুড়িয়ানার গ্রামে মানুষের মুখে মুখে সেই বীরত্বের কাহিনী এখনও কিংবদন্তি হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু ২৭ বছরেও তাঁদের বীরত্ব স্বীকৃতি পায়নি রাষ্ট্রীয়ভাবে। চাপা পড়ে গেছে তাঁদের বীরত্বের কাহিনী বড় বড় সামরিক অফিসার এবং রাজনীতিক-মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথার আড়ালে।

বীথিকা বিশ্বাস ২৩ বছর পর ফিরে যাচ্ছেন পিরোজপুরের কুড়িয়ানায় তাঁর নিজ গ্রামে। তার বড় ভাই এবং সহযোদ্ধা সমীরণ ১৯৯১ সালে নিহত হয়েছেন সর্বহারা বাহিনীর গুলিতে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে ১৯৭৫-এ বীথিকা দেশ ছেড়েছিলেন। নিরাপত্তার আশ্বাস পেলে ফিরে আসতে চান দেশে। কুড়িয়ানার গ্রামে গিয়ে বীথিকা আবার খুঁজে ফিরবেন তাঁর পুরনো সহযোদ্ধাদের। ঘুরে দেখবেন তাঁর সেই পরিচিত রণাঙ্গন, যেখানে তিনি একদিন জীবনবাজি রেখে লড়েছিলেন শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে।"

মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের আবিষ্কারের সকল কৃতিত্ব সাংবাদিকদের। পরপর মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের খবর তারা পত্রিকায় প্রকাশ করেন ১৯৯৫ সাল থেকে। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলেয়া বেগম, বাগেরহাট জেলার মেহেরুন্নেসা মিরা ও হালিমা খাতুন, ঝালকাঠির আলমতাজ বেগম, বরিশালের মুলাদীর করুণা বেগম, কিশোরগঞ্জের সখিনা খাতুন, ফোরকান বেগম, মিনারা বেগম, রোকেয়া বেগম, রাবেয়া খানম মাজেদা,[৪৪] লেবুছড়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত BMF ও BZF গ্রুপের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মমতাজ বেগম প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানা যায়।[৪৫] এখানে সেসব বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. "আলেয়া বেগম : পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করেছিলেন[৪৬]

শত্রুপক্ষ গেড়েছে শক্ত ঘাঁটি। জড়ো করেছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। এ দেশের এজেন্টদের সঙ্গে বসে নীল-নকশা আঁকছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা আক্রমণ করবে। এ খবরে সাময়িকভাবে থমকে গেলেন কেউ কেউ। কিন্তু বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন তিনি। শাড়ি ছেড়ে পরলেন প্যান্ট-শার্ট। সকল সহযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে বললেন। হাতে তুলে নিলেন সমরাস্ত্র। একে একে প্রস্তুত হলো সবাই। ছুটলেন সম্মুখ সমরে

লড়তে। শত্রুপক্ষের অবস্থান কৌশলে জেনে নিয়ে পরিকল্পনা করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর। ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো শত্রুপক্ষের লোকদের বুক। এ দৃশ্য কোনো ফিল্মের বা কল্পনাপ্রসূত নয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা এলাকার একটি খণ্ডচিত্র।

অনেকটা এভাবেই বর্ণনা করছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম সিরাজ তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন সহযোদ্ধা আলেয়া বেগমের প্রসঙ্গে। গত ১৭ মার্চ আলেয়া বেগম মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আলমডাঙ্গা থানা কমান্ডের ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর মুক্তিযুদ্ধে আলেয়া বেগমের ভূমিকা প্রসঙ্গে জেলা ইউনিট কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম সিরাজের মুখোমুখি হলে এ প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, 'রাইফেল, বন্দুক, এসএমজি, এসএলআর—সবকিছু চালানোতেই আলেয়া সমান পারদর্শী ছিলেন। শত্রুপক্ষের শক্তি ও অবস্থান বুঝে তাদের মোকাবিলা করার জন্য এসব সমরাস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি ছুটতেন। নিমিষে ঝাঁঝরা করে দিতেন পাকহানাদার ও তাদের দোসরদের বুক। গুঁড়িয়ে দিতেন শত্রু ঘাঁটি। একাধিক সম্মুখ সমরে তার ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।"

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলেয়া বেগম প্রসঙ্গে অপর সহযোদ্ধা রেজাউল করিম বলেন, '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের চাপড়া ট্রেনিং ক্যাম্পে আলেয়া বেগম যুদ্ধকৌশল ও সমরাস্ত্র চালানো শেখেন। তখন তিনি ছিলেন সদ্য কিশোরী। বয়স ১৪/১৫'র বেঁশি না। শরীরে শক্তিমত্তা ছিল অন্যরকম। কোনো ভারী কাজে তাকে পিছপা হতে দেখা যায়নি। পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি সর্বদা আগে কদম ফেলে এগিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও সদর থানা এলাকার যুদ্ধক্ষেত্রে এই কিশোরী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করছিলেন অত্যন্ত সফলভাবে। একের পর এক এসাইনমেন্টে সে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানস্থলে ঢুকে যেতো। পাকসেনা শিবিরের কাছে ঢুঁ মেরে বের করে আনতো সব খবর।'

মুক্তিযোদ্ধা আলেয়া বেগমের স্বামী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মতিয়ার রহমান মন্টুর ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে আরো চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আলমডাঙ্গা থানা কমান্ডের ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর আলেয়া বেগম (স্বাধীনতার পর এই প্রথম সংবাদপত্রের মুখোমুখি) এ প্রতিনিধিকে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি যেদিন বীর প্রতীক হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছিলেন, সেদিন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে নারীদের যে গৌরবময় অবদান আছে তাকে পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু তা হচ্ছে না।' মুক্তিযোদ্ধা আলেয়া আরো বলেন, 'আমার প্রয়াত স্বামী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মতিয়ার রহমান মন্টু ১৯৭৫ সালের ২১ মার্চ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। সে থেকে বহু কষ্টেসৃষ্টে স্বামীর ভিটাতেই বসবাস করছি। অথচ বিগত সময়ে কেউ খোঁজ নেয়নি।' আলেয়া বেগম মুক্তিযুদ্ধে তার দুঃসাহসিক ভূমিকার স্বীকৃতি চান। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার কষ্টের কথা বলতে চান।"

২. "মেহেরুন্নেসা মিরা ও হালিমা খাতুন ২৮ বছর পর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন[৪৭]

স্বাধীনতার ২৮ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি পেলেন মেহেরুন্নেসা ও হালিমা খাতুন। ১৯৭১ সালে বাগেরহাট জেলার এই দুই নারী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। কেউ তাদের খবর রাখেনি। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের সামান্য স্বীকৃতিটুকুও পাননি তারা। বরং গত ২৮ বছর চরম আর্থিক সংকট ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কেটেছে প্রায় নিঃস্ব মেহেরুন্নেসা ও হালিমা খাতুনের।

এই দুই মুক্তিযোদ্ধার খোঁজ পেয়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তাদেরকে বাগেরহাট থেকে ঢাকায় এনে সংবর্ধনা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত নির্মূল কমিটির ৫ম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সংগঠনের পক্ষ থেকে মেহেরুন্নেসা ও হালিমা খাতুনের হাতে সম্মানপত্র তুলে দেন। তাদের প্রত্যেককে একটি করে রিকশা ও নগদ ১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। শহীদ জায়া সালমা হক প্রত্যেকের হাতে তিনটি করে শাড়ি তুলে দেন।

সংবর্ধনার জবাবে হালিমা খাতুন বলেন, 'জীবনে কখনো একসঙ্গে তিনটা শাড়ি পাই নাই। আজকে মনে হচ্ছে নতুন করে আবার জন্ম নিলাম।' বাগেরহাটের বেসরগাতির অধিবাসী হালিমার বয়স ৪৭ বছর। তার স্বামী সিরাজ শেখও মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে অসুস্থতার কারণে তিনি কোনো কাজ করতে পারছেন না। দিনমজুরি করে হালিমা সংসার চালান।

মুক্তিযুদ্ধের সময় হালিমা খাতুন তাদের এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না করতেন এবং ভিক্ষুকবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পৌঁছে দিতেন।

৪৭ বছর বয়স্ক মেহেরুন্নেসা বাগেরহাটের ফলপট্টি এলাকায় নদীর চরের বস্তিতে থাকেন। তার বাবা তসিমুদ্দিন শেখ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে হালিমার বিয়ে হয়, আর ১৯৯০ সালে স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। এখন সংসারে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে আছে। এলাকায় লাকড়ি কুড়িয়ে বিক্রি করে মেহেরুন্নেসার দিনে ২০-৩০ টাকা আয় হয়। তা দিয়েই কোনোমতে তার সংসার চলে। মেহেরুন্নেসা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাগেরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মেজর তাজুল ইসলামের কাছে অস্ত্র চালনা ও ডিনামাইট বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি জেলার দশমহল, মাহুতকান্দা, বরইগুনা, খালিশপুর, বেসরগাতি, ভুটাপুর ও সন্তোষপুর এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছে।

বাগেরহাটে নির্মূল কমিটির নেতা মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম চরমভাবে অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার কাজ করছেন। তিনি এ পর্যন্ত এমন ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পেয়েছেন। সেই সূত্র ধরে মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নেসা ও হালিমা খাতুনের খোঁজ পাওয়া যায়। সিরাজুল ইসলাম এই দুই মহিলা মুক্তিযোদ্ধাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন।

নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা শাহরিয়ার কবির সংবর্ধনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নির্মূল কমিটির নয়। তাদের জন্য সরকারের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট রয়েছে। কিন্তু নির্মূল কমিটি প্রতীকী অর্থে

অবহেলিত এই দুজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা ও উপহার দিয়েছেন। মেহেরুন্নেসা ও হালিমা খাতুনকে দেওয়া সম্মাননাপত্রে মুক্তিযুদ্ধে তাদের গৌরবজনক ভূমিকাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সাতাশ বছর পর সম্মাননা প্রদানের এই উদ্যোগ মহান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জাতীয় পর্যায়ের উপেক্ষা ও উদাসীনতার লজ্জা সামান্য পরিমাণে হলেও লাঘব করবে।"

৩. একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা আলমতাজ বেগম ছবি[৪৮]

এমনই এক মুক্তিযোদ্ধা আলমতাজ বেগম ছবি। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা একাত্তরের এক সাহসী তরুণী ছবির কথা কেউ জানি না আমরা। সেদিনের তরুণী ছবি আজ রোগে-শোকে-দারিদ্র্যে জর্জরিত। অকাল বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এক ভাগ্যাহত নারী। একদিন যে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে সেই সবল হাত তার শীর্ণ এখন। ঝালকাঠির কেওতা গ্রামের হাবিবুর রহমানের কন্যা আলমতাজ বেগম ছবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। রাজনীতি সচেতন পরিবারের সন্তান হবার সুবাদে শৈশব থেকেই ছবির মধ্যে ছিল প্রখর রাজনৈতিক বোধ। তিন ভাই ছয় বোনের মধ্যে ছবি পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান।

একাত্তরের মার্চের উত্তাল বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশবাসী ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধে। আপন দু'ভাই এবং ভাইয়ের বন্ধু সেলিম শাহনেওয়াজ মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছেন কিন্তু ছবি কী করবেন? কেননা ভাই ফিরোজ কবিরের সহপাঠী সেলিম শাহনেওয়াজের সঙ্গে ছবিদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল আগে থেকেই। ছবির সঙ্গে সেলিমের বিয়ের কথাবার্তাও ততদিনে পারিবারিকভাবেই ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের আগেই শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। বড় ভাই হুমায়ুন কবির ও সেজো ভাই ফিরোজ কবির এবং হবু বর সেলিম শাহনেওয়াজ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলে ছবিও হন তাদের সহযোত্রী। সেলিম এবং ফিরোজ কবির আগে যুদ্ধে যোগ দেন এবং তারপর ছবিকে নিয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে যোদ্ধাদের রান্নাবান্নার পাশাপাশি অস্ত্র চালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ছবি। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন সতীর্থ পুরুষ যোদ্ধাদের পাশাপাশি।

সেই ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনমনা হয়ে যান ছবি। কত রাত যে বিছানা ছাড়া ঝোপে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে, কত ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা ভাবতে গেলে এখনও শিউরে ওঠেন তিনি। চার মাস ছিলেন পেয়ারা বাগান, গরংগল, আটঘর, কুরিয়ানা প্রভৃতি রণাঙ্গনে। ভাত খেতে হয়েছে কলার পাতায়। যুদ্ধ চলাকালেই তরুণী ছবির নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কোন রকম আয়োজন আর আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই অতি সাধারণভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল সেলিম আর ছবির। জুলাই মাসে পাক হানাদার বাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ঐ অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। ৭/৮ দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করার পর তাঁরা পাকবাহিনীর হামলার মুখে টিকে থাকা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে অতি সন্তর্পণে সরে যান এবং চলে যান খুলনায়। সেখানেও একাধিক যুদ্ধে অংশ নেন তাঁরা।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত বাংলাদেশে ছবির দু'চোখে স্বপ্ন গাঢ়তর হয়, এবার স্বস্তির সঙ্গে তাঁদের সংসার হবে। সেলিম শাহনেওয়াজের সঙ্গে খুলনাতেই সংসার পাতেন ছবি। ১৯৭২-এর ৩ জুন অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের হাতে ঝালকাঠিতে নিহত হন তাঁর স্বামী সেলিম শাহনেওয়াজ। আর ৬ জুন ঢাকার ইন্দিরা রোডে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তাঁর বড় ভাই কুসুমিত ইস্পাত খ্যাত কবি, মুক্তিযোদ্ধা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হুমায়ুন কবির। পরপর তাঁর জীবন থেকে আশ্রয় হারিয়ে গেলে দিশেহারা হয়ে পড়েন আলমতাজ বেগম ছবি। তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা তিনি। স্বামীহীন, ভ্রাতৃহীন ছবি কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন? এমনি হতাশায় হাবুডুবু খেতে খেতেই '৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর তাঁর কোল আলো করে আসে শহীদ সেলিম শাহনেওয়াজের একমাত্র কন্যা সেলিনা শাহনেওয়াজ সীমা।

অসহায় বোন ছবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন বড় বোন মঞ্জিলা হক। এখানে তিন বছর কাটার পর আবার বরিশালে ফিরে যান ছবি। সেখানে পিতার সংসারে কাটে আরও ছয় বছর। কিন্তু পিতৃহীন শিশুকন্যা সিমু তখনও পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। ২৪/২৫ বছর বয়সী বিধবা কন্যা নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন পিতা হাবিবুর রহমান। তখন নিরুপায় হয়ে শহীদ সেলিম শাহনেওয়াজের বড় ভাইকে বিয়ের প্রস্তাব দেন অসহায় পিতা। সেলিমের বড় ভাই মঞ্জুরুল আলম বিয়েতে সম্মত হন এবং ছবি ফিরে পান নিরাপত্তা। কিন্তু সে সুখ একটি দশকও সইলো না মুক্তিযোদ্ধা ছবির কপালে। ১৯৮৭ সালে মঞ্জুরুল আলম হৃদরোগে ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় সংসারে রয়েছে ছবির আর একটি মেয়ে।

দুই মেয়ে নিয়ে চরম দুঃখকষ্টে দিন যাপন করছেন ছবি। বড় মেয়ে সিমু ১৯৯৩ সালে বি.এ. পাস করেছেন। কিন্তু চাকরির সন্ধানে ছুটেও মায়ের জন্য সহায় হতে পারেননি আজ পর্যন্ত।

আলমতাজ বেগম ছবি কারও কাছে আজ আর কিছু চান না। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত ছবি কেবল স্বীকৃতি চান। সে স্বীকৃতি একজন মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি। তাঁর সহযোদ্ধারা অনেকে এখনও বেঁচে আছেন। জীবনের শুরুতেই একের পর এক বিপর্যয়ের ঝড়ে বিধ্বস্ত ছবি যখন অতীতের দিকে তাকান তখন তাঁর চোখ ফেটে আসে কান্না। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতির জন্য তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ছবি তাঁর দারিদ্য বেকারত্ব সব ভুলে যাবেন, যদি তাঁর সন্তানরা গর্বিত জননীর অবদানের স্বীকৃতি দেখতে পায়। আলমতাজ বেগম ছবির স্বীকৃতি মিলবে তো?

৪. করুণা বেগম[৪৯]

এমনি একজন মর্যাদাপূর্ণ নারী করুণা বেগম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার মুক্তির মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলোতে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠেছিলেন গ্রামবাংলার সহজ সরল কিশোরী গৃহবধু করুণা বেগম। বরিশাল জেলার মুলাদী থানার অন্তর্গত পাতারচর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম শাহ আলী আহমেদ।

দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক শহীদুল হাসানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের সৈনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ শহীদুল হাসান চুন্নু কাজীর চর আওয়ামী লীগের সম্পাদক ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে শহীদুল হাসান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সহযোদ্ধাদের অনেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণে গেলেও তিনি দেশের অভ্যন্তরেই ট্রেনিং নিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে তখন হাত মিলিয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী মীরজাফরের প্রেতাত্মারা। ওই ঘৃণিত অপশক্তির সহায়তায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তখন সারা দেশে ঘৃণিত ও ধিক্কৃত রাজাকার বাহিনী গঠন করে। তারা মুক্তিসেনাদের আখ্যায়িত করেছিল দুষ্কৃতকারী হিসাবে। এই নরপশু স্থানীয় রাজাকাররা একদিন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যায়। মুলাদীর জয়ন্তি নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে নরপশুরা দুজন যুবককে গুলি করে হত্যা করে। এদের একজন ছিলেন শহীদুল হাসান—করুণার স্বামী।

স্বামীর মৃত্যুর পর করুণা বেগম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিন বছরের একমাত্র পুত্র মান্নাকে নিয়ে তিনি শোক ও দুঃখের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর বুকে জমে থাকা এই পর্বত পরিমাণ শোক এক দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি নিজেই দুশমনদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেন। উদ্দেশ্য দেশমাতৃকার মুক্তি এবং প্রিয়তম স্বামী হত্যার প্রতিশোধ। এভাবে স্বামীর মৃত্যুর মাত্র এক মাস পরে ৩ বছর বয়সের অবুঝ শিশুকে রেখে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন গেরিলা বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য।

বরিশালের মুলাদী থানার কুতুব বাহিনীতে করুণা বেগম অন্য মহিলাযোদ্ধাদের সঙ্গে অস্ত্র শিক্ষা নিতে থাকেন। এই বাহিনীর অধীনে ৫০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। করুণা বেগম এই দলের কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি গ্রেনেড, স্টেনগান ও রাইফেল চালানো শেখেন এবং যে কোন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। গেরিলা যোদ্ধা করুণার কাজ ছিল ছদ্মবেশে শত্রু-ছাউনির ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। কখনও ভিখারীর বেশে, কখনও গ্রাম্য কুলবধূর বেশে তিনি শত্রু শিবিরে নির্ধারিত অপারেশন চালিয়েছেন।

নিবেদিত প্রাণ নির্ভীক মুক্তিসেনা করুণা বেগম অসমসাহসিকতার সঙ্গে বহু জায়গায় তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। বরিশাল জেলার কসবা, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দিবাজার ও টরকীতে শত্রুর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

একদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের দায়িত্ব পড়ে করুণা বেগমের ওপর। পাকবাহিনী তখন মাহিলারায় শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছে এবং নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর যথেচ্ছ নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। মুক্তিসেনারা একদিন এই ঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৫জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষের একটি দল করুণা বেগমের নেতৃত্বে ওই ঘাঁটি আক্রমণ করে। তিনি নিজেই পর পর পাঁচটি গ্রেনেড নিক্ষেপের মাধ্যমে আক্রমণ রচনা করেন। দিশাহারা ক্রুদ্ধ পাকসেনারাও এলোপাতাড়ি গুলি

ছোড়ে। মুক্তিসেনারা স্বল্পসংখ্যক হলেও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে চার ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে যান। এই যুদ্ধে ১০ জন শত্রুসেনা হতাহত হয়। অপর পক্ষে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র একজন আহত হন। তিনিই ছিলেন সেই নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা। পাক সেনাদের একটি গুলি তার ডান পায়ে বিদ্ধ হয়েছিল।

দেশ তখনও মুক্ত হয়নি। তাই একজন সাধারণ গৃহবধূর পরিচয়ে মুলাদী থানা হাসপাতালে করুণা বেগমের চিকিৎসা হয়। কিন্তু ওই হাসপাতালের চিকিৎসা পর্যাপ্ত ছিল না। কাজেই তিনি স্বাভাবিক চলার শক্তি হারান। এরপর লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে এলো কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বরিশাল হাসপাতাল এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে বেশ কিছু দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন করুণা বেগম। কিন্তু তাঁর পা আর ভাল হয়নি। ক্র্যাচে ভর করেই তিনি চলাফেরা করছেন।

এরপর ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তন হলো অশুভ অপশক্তির ষড়যন্ত্র আর নৃশংসতার মাধ্যমে। আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধার মতো করুণা বেগমও এক বুক হাহাকার, অব্যক্ত ব্যথা আর যন্ত্রণা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অবলম্বন করে বেঁচে থাকলেন। এই এতটা বছর বড় কষ্টে কেটেছে তাঁর। অকাল বৈধব্যের কষ্ট, স্বাভাবিক চলার শক্তি হারানোর কষ্টের সঙ্গে সীমাহীন দারিদ্র্য অপচ্ছায়ার মতো মুক্তিযোদ্ধা এই নারীর জীবনকে ঘিরে রেখেছে। দিনে দিনে আরও বেশি অসুস্থ হয়েছেন। কিডনির অসুখ বেড়েছে। সংসারের কঠিন অভাব অনটনের ফাঁকফোকর দিয়ে অকাল বার্ধক্য এসে কড়া নাড়ছে। একটি মাত্র ছেলে, যাকে কোলছাড়া করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, সেও অভাব অনটনের সংসারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। দু'বেলা খাওয়ার খরচ জোটে না সেখানে আবার চিকিৎসা! ছেলে এবং নিজেও বিনা চিকিৎসাতেই একপেট-আধপেট খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবনের বোঝা বইছেন। করুণা বেগম জানে না এই দুর্বিষহ জীবনের শেষ কোথায়।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দুটো রাষ্ট্রীয় ভাতা পেতেন তিনি। একটি শহীদ স্বামীর কারণে অপরটি নিজে যুদ্ধাহত বলে। ছেলের ১৮ বছর পর্যন্ত একটি ভাতা পেয়েছেন। এটা বন্ধ হয়ে গেছে। পঙ্গু ভাতাও এখন পাচ্ছেন না। এখন তাঁর দিন চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। করুণা বেগম এখন এই পঙ্গু ভাতাটি চাচ্ছেন অন্তত পক্ষে কোনভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসাবে।

২১ বছর পর স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। তাই নতুন আশায় অন্য অনেক বঞ্চিত অসহায় মুক্তিযোদ্ধার মতো করুণা বেগমও একটুখানি আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। তবে তিনি সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বড় বেশি আশাহত হয়েছেন।

গত ২১-১১-৯৬ তারিখে ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরও ওই দলে থাকার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে করুণা বেগমের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, তিনি মহিলা মুক্তিযোদ্ধা বলেই কি তাঁকে শেষ পর্যন্ত দলে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না?

করুণা বেগমের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তিনি তাঁকে পুনর্বাসিত করার আশ্বাস দিয়ে

মোহাম্মদপুরে একটি বাড়িও তাঁর নামে বরাদ্দ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ওই বাড়িটিও তিনি পাননি। বর্তমানে মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্য নিয়ে তিনি কোনরকমে দিনাতিপাত করছেন। ঢাকাতেও তিনি একটি শহীদ পরিবারের আশ্রয়ে আছেন শহীদের স্ত্রী এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে। করুণা বেগমের জীবনের একান্ত ইচ্ছা, যে মহান নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর স্বামী শহীদ হয়েছেন এবং তিনি পঙ্গু হয়েছেন সেই জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি বার দেখা করে দুটো কথা বলা।

৫. কিশোরগঞ্জের সখিনা খাতুন[৫০]

মুক্তিযোদ্ধা সখিনার সংগ্রাম চলছেই। সখিনা খাতুনের বয়স এখন সত্তর পেরিয়ে গেছে। সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে শুরু করলে এখনও মুহূর্তে আপাদমস্তক বদলে যায় তাঁর সবকিছু। বয়স্ক দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় 'জানতাম জিতবই, জিততে না পারলে সবার সাথে আমিও শহীদ হয়ে যেতাম।' এই অপরাজেয় মনোবলের অধিকারিণী সখিনা স্বাধীনতার ২৭ বছর পরেও আমাদের জানাশোনার গণ্ডির আড়ালে-অন্তরালে রয়ে গেছেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একটি সার্টিফিকেট তাঁর নেই। কিশোরগঞ্জের কয়েক ওয়াকিফহাল ব্যক্তির উদ্যোগে সখিনা শনিবার এসেছিলেন জনকণ্ঠ অফিসে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর চাওয়া পাওয়ার তেমন কিছুই নেই। শুধু চান মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি নিয়েই মরতে চান সখিনা বেগম।

সখিনা একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের সংবাদদাতার ভূমিকায় কাজ করেছেন। ভিখারিণীর বেশে ঘুরে বেড়াতেন। রেকি করতেন শত্রু পাকিস্তানি সৈন্য, রাজাকার, আলবদর বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে। সঠিক সংবাদটি পৌঁছে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। যুদ্ধ, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ চলত সে তথ্য অনুসারেই। কিশোরগঞ্জের নিকাল থানার গুরুই গ্রামে বাড়ি সখিনার। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কিশোরগঞ্জ জেলাতেই চলত তাঁর কর্মতৎপরতা। যুদ্ধের আগে তিনি পেশায় ছিলেন ধাই। সরকারী হাসপাতালে ৭ টাকা মাসিক বেতনে এই কাজ শুরু করেছিলেন। বেতন ১৫ টাকা হয় একাত্তরে। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে প্রসূতিদের সেবা-শুশ্রুষা, ডেলিভারিতে সহায়তা করে আয় তার ভালই ছিল। যৌবনে বিয়ে হয়েছিল একই গ্রামের কিতাব আলীর সঙ্গে। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় তিনি প্রতিবাদে ঘর ছাড়েন। আর বিয়ে করেননি। সন্তানাদিও হয়নি। আর একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারাই তার সন্তান হয়ে ওঠেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কারও কারও মা, কারও কারও খালা, বোন হয়ে উঠেছিলেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া, দেখাশোনা, রোগে-শোকে সেবা করেছেন।

কখনও ভিখারিণী, কখনও পাগলিনীর ভূমিকায় ঘুরে বেড়াতেন। পাকিস্তানী সৈন্যরাও তাকে ভিখারিণী বা পাগলিনী হিসাবেই চিনতো। কখনও ঠাট্টামস্করা, কখনও এ নিয়ে নানা ভর্ৎসনা করতো তাকে। বার কয়েক সন্দেহভাজন হিসাবে আটকাতে চেয়েছিল। চিল্লাচিল্লি করে কেঁদেকুটে বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করে বেরিয়ে এসেছেন। অন্ধকার রাতে ক্রলিং করেও গিয়েছেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। এসব কিছু শিখেছেন মুক্তযোদ্ধাদের কাছে। খাওয়া দাওয়া চলত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। বললেন

পোলাপানরা (মুক্তিযোদ্ধারা) যেভাবে জীবনপণ বাজি রেখে লড়েছে তা দেখে মন ভরে যেত। ভয় মনে যা ছিল তা কখন যে উধাও হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। তখনকার অনেক কথা মনে হলে এখনও ভয় পাই। তখন ভয় পাইনি। আর একটি কথা বললেন, তা হলো একাত্তরের রাজাকারদের যেমন প্রতাপশালী দেখেছি, আজও তাদের প্রতাপ প্রতিপত্তি একটুও কমেনি। এই একটা বিষয় দেখেই শুধু দুঃখ পাই। মুক্তিযোদ্ধারা এখনও দেখা হলে নানী, খালা ডাকে। সম্মান করে এটা-সেটা খাওয়ায়। এতে খুবই সম্মানিত মনে হয় নিজেকে।

যুদ্ধের পর সখিনা বেগম আবার পুরনো ধাইর পেশায় ফিরে যান। গুরুই গ্রামে একাত্তরে ক্ষতিগ্রস্ত, দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য যে শিবির তৈরি করা হয় তারই একটি ঘরে থাকেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কোন সার্টিফিকেট, স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন ভাতা বা সুযোগ সুবিধা কখনও পাননি। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির যে উদ্যোগ নিয়েছিল তখন তাঁর ফরম পূরণ, ছবি তুলেছিলেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু সেই স্বীকৃতির পরিচয়পত্রও তিনি আর পাননি। বুড়িয়ে গেলেও ধাই হিসাবে পুরনো পরিচিত থাকায় তাঁর সামান্য আয় রোজগার এখনও কিছু আছে। সরকার বয়স্ক ভাতা দেবার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেখানে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। বয়স্ক ভাতা তিনি পাচ্ছেন এটা দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর। জনকণ্ঠ অফিসে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি চান আপনি। টাকা-কড়ি, সুযোগ-সুবিধা চাইলেন না তিনি। বললেন, শুধু চাই স্বীকৃতি। আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। এটুকু স্বীকৃতি পেলে তাহলেই আমি মরতে পারি। আর কিছু চাওয়ার নেই আমার।"

ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'সবাই মুক্তিযোদ্ধা, তবুও কয়েকজন' শিরোনামে সন্‌জীদা খাতুন, ফরিদা রহমান, মালেকা বেগম, আয়শা খানম, রাবিয়া আখতার ডলি, বেবী মওদুদ, সাইদা কামাল, ডা. লায়লা খান, প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কর্মী, মুক্তিযোদ্ধার কথা।[৫১] সেই প্রতিবেদন থেকে এদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো :

সন্‌জীদা খাতুন

শিল্পী, অধ্যাপক

১৯৭১ সাল। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের বছর। কিন্তু মূলত ১৯৪৮, ১৯৫২ সালের ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের মাধ্যমেই মূল সংগ্রামের সূত্রপাত। এই সংগ্রামের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। এক্ষেত্রে শিল্পী সমাজের ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষকে তারা করেছে উদ্বুদ্ধ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে জানিয়েছিলাম হানাদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে। এই প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছিলাম সঙ্গীতকে। কারণ সুর যেভাবে একটি বক্তব্যকে সহজেই মানুষের কাছ হৃদয়স্পর্শী করে তুলতে পারে, অন্য অনেক

কিছুতেই তা সহজে সম্ভব হয়ে উঠে না। যেমন মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে আমরা ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত করি। বাঙালি ভাষাভাষীদের জন্য এটি একটি ব্যতিক্রমী অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আবার ছয় দফার আন্দোলনেও বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক গান যেমন—'মানুষ হ মানষ হ আবার তোরা মানুষ হ, বিশ্বমানব হবি যদি শাশ্বত বাঙালি হ', 'বাংলা মা দুনির্বার আমরা তরুণ দল', রবীন্দ্রনাথের গান 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা, 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি, সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে'—এই ধরনের অনুপ্রেরণামূলক গান গেয়ে সব মানুষকে প্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আবার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একপর্যায়ে আমাদের কিছু সংখ্যক শিল্পীদের ওপারে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় এবং গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী সংস্থা'। যার সেক্রেটারি ছিলেন মাহমুদুর রহমান রেনু এবং প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি (সনজীদা খাতুন)। এই পর্যায়ে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান 'রূপান্তরের ইতিহাস' মঞ্চায়িত হয় রবীন্দ্র সদনে। অনুষ্ঠানের গ্রন্থনায় ছিলেন শাহরিয়ার কবীর। ধারা বিবরণীতে হাসান ইমাম এবং মঞ্চ সজ্জায় মুস্তফা মনোয়ার। এতে বাঙালি জাগরণের সমস্ত ইতিহাস ছিল। এরপর দিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নানান দেশ, নানান জাতিকে আমাদের নিপীড়ন, পোষণের ইতিহাস জানানো হলো। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণকে সমব্যথী করে তোলা হলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শরণার্থী শিবিরে এবং মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে গিয়ে গান গাওয়া। এই সময় অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে আমাদের গানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতো এবং 'জয় বাংলা' বলে জয়ধ্বনি করতো। সেই সময় শেখ লুৎফর রহমানের গান দারুণ উজ্জীবিত করেছিল। এছাড়াও শিল্পী কামরুল হাসানের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থ দলগতভাবে একটি সাধারণ তহবিলে রাখা হতো। সেখান থেকে প্রয়োজনের সময় শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অবদান সম্পর্কে বলতে গেলে কারো একক ভূমিকা বলা খুব কঠিন। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি কাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দলগত প্রচেষ্টায় আজকের এই স্বাধীনতা।

ফরিদা রহমান (প্রয়াত)

সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিএনপি

সে সময়টায় আমি ছিলাম পূর্ব পাকিস্তান মহিলা আওয়ামী লীগের ঢাকা সিটি শাখার সম্পাদিকা। ফলে বাধা ছিল চারদিকে। স্বাধীনভাবে কোনো কাজই করতে পারতাম না। যা করতাম, লুকিয়ে-চুরিয়ে। সে সময় আমার প্রধান কাজ ছিল স্যালাইন যোগাড় করা। বাসা থেকে বেরুতাম। হাতে থাকতো ফলের ঝুড়ি, যেন রোগী দেখতে যাচ্ছি। তারপর একেকটা দোকানে যেতাম। একটা দুটো করে স্যালাইন যোগাড় করতাম। এক দোকান থেকে খুব বেশি নিতে পারতাম না, লোকে সন্দেহ করতো। বিভিন্ন দোকান, হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে এসব যোগাড় করতাম, তারপর পাঠাতাম মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। যেহেতু কলেজে অধ্যাপনা করতাম, ফলে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিল নিয়মিত।

কদিন পরপরই ছেলেরা আসতো আমার কাছে। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য টাকা পয়সা চাইতো। যা পারতাম, দিতাম। সে সময় নিজেই তো বেতন পেতাম ২০০ টাকা। তার থেকে ৫০/৬০ টাকা করে দিতাম একে-তাকে। তবে কখনোই কাউকে খালি হাতে ফেরত পাঠাইনি। ১৫/২০ টাকা হলেও দিতে চেষ্টা করেছি।

যুদ্ধের শেষ দিকে কানে এলো—গরম কাপড় লাগবে যোদ্ধাদের। কম্বল মোজা, সোয়েটার, শাল যার কাছ থেকে যা পেয়েছি, নিয়ে এসেছি। তবে এগুলো সবই ছিল নিজেদের মধ্যে। ভাই, বোন, খালা, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যোগাড় করতাম সবকিছু। বাইরের কারো সাহায্য নিতাম না। সারাক্ষণ মনে ভয়—কার মনে কি আছে। তো, এসব কালেক্ট করে রায়ের বাজারে এক বাড়িতে রেখে আসতাম। কিন্তু কে যে নিতো, কখন নিতো, কোথায় নিতো যেসব জানতে পারিনি। শুধু সান্ত্বনা পেতাম—হয়তো কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য করতে পারছি, তার উপকারের জন্য একটু হলেও কাজে আসতে পারছি।

মালেকা বেগম

নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই সক্রিয় রাজনীতি শুরু করি। ১৯৬২-৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে রোকেয়া হলের ছাত্রী সংসদে সহসভানেত্রী পদে দু'বার এবং ডাকসু সদস্য হিসেবে একবার নির্বাচিত হই। পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হই। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের দিকে নারী আন্দোলনের কাজে হাতেখড়ি শুরু। এ সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ অন্যান্য মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। বন্দিদের আত্মীয়-স্বজন, সমর্থকদের মধ্যে থেকে নারীদের আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করার কাজ করা শুরু হয়। বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা সংগ্রহ, বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের স্বাক্ষর সংগ্রহ, লিফলেট বিতরণ, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান ইত্যাদি করতে হয়েছে। এসবের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে গিয়ে কিছুদিন রিকশাচালক সমিতির কাজ করেছি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংগঠিত মহিলাদের সংগঠিত করার প্রয়োজনে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিলে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আমাকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হলো 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকদের সমমজুরি, পর্যাপ্ত সংখ্যায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, জিনিসের দাম কমানো, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিসহ নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছিল। আমার দায়িত্ব ছিল যতো প্রকারে সম্ভব এই নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা। তখন লিফলেট লেখা, পত্রিকায় লেখা, বাড়ি-স্কুল-কলেজ-হোস্টেলগুলোতে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা, বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্য নেওয়া এগুলো করেছি। যুদ্ধের

শুরুতে বংশালে আমার শ্বশুর বাড়িতে ছিলাম। পরে ১৪ এপ্রিলের দিকে কাপাসিয়ায় যাই, সেখান থেকে আগরতলার 'ক্র্যাফটস' ক্যাম্পে গিয়ে উঠি মে মাসে। সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা, খবর, বুলেটিন এবং শরণার্থীদের থেকে নারীদের ওপর অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করে মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে বুকলেট লেখার কাজ শেষ করি। ভারতীয় নারী ফেডারেশনের আমন্ত্রণে ওদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মতিয়া চৌধুরী ও আমি যোগ দেই দিল্লিতে। দিল্লিতে তখন ইন্দিরা গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরির সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাই। যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় মেয়েদের সমর্থন আদায়ের জন্য কলকাতা থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি, পানিপথ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি প্রভৃতি বহু স্থানে যেতে হয়েছে, বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর সুযোগ-সুবিধার তদারকি করতে হয়েছে বিভিন্ন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে হয়েছে। নভেম্বরের শেষের দিকে আগরতলায় কাজ করি। ১৬ ডিসেম্বরের পরে দেশে ফিরেছি।

রাফিয়া আখতার ডলি

সাবেক সভাপতি, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স

স্কুলে পড়া অবস্থা থেকেই রাজপথের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। হামিদুর রহমানের শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, আমি তার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ১৯৬৯-এ দলের সঙ্গে বিভিন্ন জেলা সফরে গিয়েছি। রাজপথে মিছিল, সমাবেশে উপস্থিত থেকেছি। পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে রেহাই পেতে তখনো মেয়েরা মিছিলের সামনে থাকতো। কিন্তু সেই সময়ের পুলিশ মেয়েদের রেহাই দিতো না। ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৭টি মহিলা আসনের একটির জন্য আমি জয়ী হয়েছি আওয়ামী লীগ দলের পক্ষে। আমি এম এল এ হলাম। একাত্তরের ৩ মার্চ সংসদ বসার কথা ছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার ১ মার্চ ঘোষণা দিলো সংসদ বসবে না। সরকারের এই সিদ্ধান্ত শোনামাত্র আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে হোটেল পূর্ববাণীর দিকে রওনা হই। সেখানে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভা চলছিল। আমরা পৌছানোর পর উপস্থিত ছাত্র জনতা দাবি জানালো সেদিনই যেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। মার্চের শুরু থেকেই সাজেদা চৌধুরীর ইন্দিরা রোডের বাসায় মেয়েরা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। সাজেদা আপার নেত্রীত্বে মুক্তিযুদ্ধে তৈরি থাকার জন্য ঢাকার আনাচে-কানাচে কমিটি গঠন করলাম। ২৫ মার্চ আগারগাঁও-এর একটি স্কুলে মেয়েদের নিয়ে মিটিং করছি, এমন সময় খবর এলো পাকমটর (বাংলামটর) মোড়ে সংগ্রাম পরিষদের ছেলেরা ব্যারিকেড দিতে গেলে আর্মির গুলিতে একজন মারা যায়। খবর পেয়ে আমরা মিটিং শেষ করে চলে আসি। আসার সময় ফার্মগেটে ব্যারিকেড। পুলিশ গাড়ি আসতে দিচ্ছিলো না। আমরা হলে ফিরতে পারলাম না। সেদিনের মতো আমি সাজেদা আপার বাসায় থেকে গেলাম। রাত ৯টা থেকে শুরু হলো গোলাগুলি। রাত ১২টার সময় খবর এলো বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গেছে। পাকবাহিনী বিভিন্ন হল এটাক করেছে। তখন আমি আর সাজেদা আপা টেবিল দিয়ে উঠে দেয়াল টপকালাম। আশ্রয় নিলাম পিছনের বাড়িতে। ২৭ মার্চ কার্ফ্যু দুঘন্টার জন্য যখন উঠে

গেলো তখন পাশের বাড়ির একটা মেয়ের কাছ থেকে সালোয়ার কামিজ এনে সেটা পড়ে সাজেদা আপার বাড়ির পিছন দিক দিয়ে হেঁটে বস্তির ভিতর দিয়ে বাসায় ফিরলাম। আসার সময় দেখলাম পুরো বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাসায় ফিরে ঠিক করলাম, ঢাকায় আর থাকা যাবে না। নিজ এলাকা টাঙ্গাইল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বোনের গাড়িতে সবাই মিলে রয়ানা হলাম টাঙ্গাইলের দিকে। পথে গাড়ি থামিয়ে চেক করলো পাক আর্মি। কিন্তু ওরা আমার ব্যাগে রাখা এম এল এর কার্ডটি খুঁজে পায়নি। তারপর টাঙ্গাইল থেকে তুরা বর্ডার দিয়ে ২৫ মাইল হেঁটে ভারতে পৌঁছি। সেখানে মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ দেই। ১৪ ডিসেম্বর যশোরের ঝিকরগাছায় প্রথম মুক্তাঞ্চলে মিটিং করতে যাই। ২২ ডিসেম্বর আমি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসি।

আয়শা খানম

সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ভিপি, ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী এবং স্টুডেন্ট সেকশন কমিটির সদস্য ছিলেন আয়শা খানম। বর্তমানে মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা।

মার্চের আন্দোলনের সময় ছাত্রীরা যখন হল ত্যাগ করলো, তখন থেকেই তৎকালীন ছাত্রীনেত্রী রাকার বাসাতেই তিনি ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে ঠিক ১০-৩০টায় গোলাগুলি। ঘুম ভেঙে যায়। শুরু হয় মার্চের দাবদাহ।

২৮ মার্চ মতিউর রহমানের নানা বাড়ি কাপাসিয়ায় যান। পরে সীমান্ত পেরিয়ে এপ্রিলের শেষে আগরতলা ক্রাফ্‌ট হোস্টেলে ওঠেন। এ হোস্টেলটি ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়নের ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তিনি মূলত মোটিভেশনের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সে সময় স্বাধীন বাংলা বেতারে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন। ট্রানজিট ক্যাম্পেও তিনি কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কনডেনড কোর্সে নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে গান্ধী বল্লভ হাসপাতালে মাস দেড়েক কাজ করেন। তিনি প্রায় ৭/৮ মাস মোটিভেশনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সেনা নায়কদের মধ্যে বীরোত্তম খালেদ মোশাররফ ও বীরোত্তম শওকত আলী মাঝে মাঝে ক্যাম্প পরিদর্শনে আসতেন। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের সহযোগিতা পেতেন সব সময়। পরবর্তীকালে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই এক মাস কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে আগরতলা থেকে কাজ করেন। ক্রাফ্‌ট হোস্টেলে নিজামুদ্দিন আজাদ ও সিরাজুম মুনির যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষে দেখা করতে আসলে তাদেরকে ঠাট্টাছলে বলেন আয়শা খানম, 'কি ব্যাপার, সিভিলিয়ানের ড্রেসে এসেছেন কেন?' প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেছিলেন—পরে যখন আসবেন, মিলিটারির পোশাকেই আসবেন। তারা ফিরে আসেননি। ১১ নভেম্বর বেতিয়ারার যুদ্ধে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সকলের কাছে স্মৃতি হয়ে আছেন।

সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়নে তিনি বলেন, 'সেদিন আমার যতোটুকু না ভূমিকা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মত্যাগ ছিল সাধারণ মানুষের।'

বেবী মওদুদ

সাংবাদিক

স্কুল কলেজের সময়টা আমার কেটেছে পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে অর্থাৎ রাওয়ালিপিন্ডিতে। কিন্তু গানবাজনা, পড়ালেখার প্রতি আমাদের পরিবারের ছিল ভিন্ন একটা টান। ফলে ছোটবেলা থেকেই নানা ধরনের বই পুস্তক, ম্যাগাজিন পড়ার অভ্যাসটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিনই ঘরে আসতো পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র, বই, জার্নাল। এতে করে দেশের সঙ্গে কোনো দূরত্বই তৈরি হতে পারেনি। বরং দূরে থাকার কারণেই হয়তোবা আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়েছিলাম দেশের খবরের জন্য, দেশের কথা জানবার জন্য। আর এভাবেই হয়তো মানসিকতাটা গড়ে উঠছিলো স্বাধীন দেশ গড়ে তোলার।

একাত্তরের শুরু, আমার অনার্স ফাইনালও শুরু। পরীক্ষা দিচ্ছি, মিছিল করছি—

'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো।'
'মা বোনেরা অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো'

'৭১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকেই আমরা কজন বন্ধুবান্ধব মিলে বের করতে শুরু করলাম 'রানার' পত্রিকা। সারা সপ্তাহের খবর বেরুতো সেখানে। পৌঁছে দেওয়া হতো ঘরে ঘরে। কিন্তু ২৫ মার্চের পর সেটা আর সম্ভব হলো না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো সবাই। বন্ধ হলো পত্রিকার কাজ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই তখন তৎপর। কিছু একটা করতেই হবে। মালেকা আপা, সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আমরা মেডিকেলের ছাত্রীদের নিয়ে শুরু করলাম—পাড়ায় পাড়ায় ফার্স্ট এইড ও আত্মরক্ষামূলক ট্রেনিঙের ব্যবস্থা। আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও কাজ করতে লাগলো প্রতিদিন। চারদিকে কেবল পরিচিতদের মৃত্যুর খবর। নিখোঁজের খবর। দেশের ভিতরেই রয়ে গেলাম। ঢাকায় থেকে চেষ্টা করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে। আমার অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ। অসহযোগের সময় আমি টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করেছিলাম—'বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি'। ফলে মুখটা চেনা ছিল আমার। হুটহাট বাইরে ঘোরাফেরা খুব একটা সম্ভব হতো না। তারপরও বেরুতাম, খোঁজ খবরের চেষ্টা করতাম। একদিন শুনলাম—বোরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গেলাম। তিনি কিছু চিঠি দিলেন। কজন বিদেশীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এসব চিঠিই বাইরের সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে শুনলাম—মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড় সংগ্রহ করতে হবে। শুরু হলো যোগাড় করার কাজ। যতোটা সংগ্রহ হলো সবই পাঠানো হলো সুফিয়া কামালের বাড়িতে। উনি যেন কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠালেন। কোনোভাবে আরো কয়েক মাস কেটে গেল আর তারপরই এলো সেই ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় দিবস।

সাইদা কামাল

চিত্রশিল্পী

মুক্তিযুদ্ধে সেবিকা হিসেবে বিশেষ অবদানের জন্য পরিচিত দুটো নাম। সাইদা কামাল (টুলু) এবং সুলতানা কামাল (লুলু)। কবি সুফিয়া কামালের দুই কন্যা। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ক'মাস, অর্জন করেছেন এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। সাইদা কামাল শোনালেন তাদের সেই অভিজ্ঞতার কথা—'আমি তখন চারুকলার ছাত্রী। '৭১-এর এপ্রিল কি মে মাসের কথা। ঢাকায় একের পর এক চলছে ধ্বংসযজ্ঞ। বাসায় বন্দি হয়ে আছি, কিছুই করার ছিল না। সে সময়ই একদিন বর্তমানে (১৯৯৬) বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদৎ চৌধুরী, ফয়েজ আলী—এরা জানালেন যে, আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা হাসপাতাল খোলা হচ্ছে। সেখানে কিছু সেবিকা প্রয়োজন। জুনের ১৫ তারিখের দিকে ঢাকা থেকে একটা দল সেখানে যাবে। আমরা ঠিক করলাম ওদের সঙ্গে যাবো। গায়ে বোরখা চাপিয়ে নানাভাবে অনেক কষ্টে বিভিন্ন চেকপোষ্ট পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত কুমিল্লার খানিকটা আগে 'কাবিলা' গ্রাম দিয়ে বর্ডার ক্রস করে পৌঁছলাম সোনামুড়া। গ্রামটি আগরতলা থেকে ৩৫ মাইল দূরে। সন্ধ্যার দিকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ক্যাপ্টেন আখতারের সঙ্গে দেখা। তিনি জানালেন যে, এখানেই একটা হাসপাতাল করতে চান। আমরা দু'বোন থেকে গেলাম। কিছুদিন পর আখতার ভাইয়ের স্ত্রী খুকুও যোগ দিলেন।

থাকতাম সোনামুড়া ফরেস্ট বাংলোতে। আমাদের তো নার্সিং বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা। ছেড়ে দিলেন তার বাগান। বাঁশের টানা ব্যারাক দিয়ে তৈরি হলো ৪০ বেডের হাসপাতাল। ২৬ আগস্ট কাজ শুরু হলো। ইতিমধ্যে বেশ কজন ডাক্তার এসে গেছেন। সব মিলিয়ে মেয়েও আমরা ১০ জন। নভেম্বর পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই কাজ চলছিল। এরপর খালেদ মোশাররফ আহত হলেন, আখতার ভাই চলে গেলেন যুদ্ধে। আস্তে আস্ত দলটা ছোট হয়ে আসলো। নভেম্বরের শেষ দিকে আমরাও চলে গেলাম কলকাতায়।

ডা. নায়লা খান

সম্মিলিত নারী সমাজ নেত্রী

২৭ মার্চ সকালবেলা। বাবা (সেক্টর কমান্ডার নুরুজ্জামান) ডেকে পাঠালেন আমাদের ৩ ভাইবোনকে। গেলাম। বাবা বললেন, 'এতোদিন সংগ্রাম ছিল মিছিল আর শ্লোগানের। আজ থেকে সংগ্রাম হবে সশস্ত্র। আমি চলে যাচ্ছি। তোমরা যেভাবে পারো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো।'

পালালাম আমরা। প্রথমে গেলাম করোতিয়া, সেখান থেকে গাব্বিনা। ওখানেই প্রথম মুক্তিযোদ্ধা দেখি। এটা জুনের প্রথম দিকের ঘটনা। জুনের মাঝামাঝি সময় শুনলাম—একটা গানের দল তৈরি হয়েছে। তারা বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা দু'বোন চলে গেলাম ঐ দলে। ফিরে এলাম কিছুদিনের মধ্যেই। সে

সময় আমার মা বোন মিলে গড়ে তোলে বাচ্চাদের অরফানেজ। আমাদের সঙ্গে ছিল রেহানা উদ্দিনা, শাহানা, জারিনা। আজ ভীষণভাবে মনে পড়ছে মৈত্রী মাসিমা আর গৌরী আইয়ুবের কথা। কেননা অক্টোবরের প্রথমে আমরা তাদের হাতেই অরফানেজের দায়িত্ব দিয়ে রওনা হলাম সেক্টর-৭-এ। বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তখন সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

তখন আমাদের সঙ্গে সারা রাত বসে থাকতাম। পোস্টার তৈরি হতো। বাঁশ লাগানো, পোস্টার সাঁটানো, কাগজ পেন্সিল জড়ো করা, সে এক হুলস্থুল অবস্থা। কিন্তু এ সবকিছুই চলতো চুপিসারে।

ট্রেনিং-ই ছিল না। কিন্তু সে সময় মুক্তিবাহিনীর জন্য যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আখতার ভাই ট্রেনিং দিলেন। তারপরই বাংলো থেকে খানিকটা দূরে একটা ছোটখাটো ঘরে ১০/১২টা চাটাই বিছিয়ে খোলা হলো হাসপাতাল। গুলি খাওয়া, শেলে আহত মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আসতো। কারো হাত নেই, কারো পা নেই। প্রথমদিকে সহ্য করতে পারতাম না। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেলো। গ্রামটি ছিল সেক্টর-২-এর আন্ডারে। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ খুব খোঁজ খবর নিতেন। কিন্তু গ্রামটা বর্ডারের কাছাকাছি বলে খুব শেলিং হতো। নিরাপত্তার খাতিরে হাসপাতাল স্থানান্তর করা হলো। দারোগা বাগিচা বলে একটি টিলায় ১০টা তাঁবু খাটিয়ে শুরু হলো কাজ। আগস্ট পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। কিন্তু সেখানে যন্ত্রপাতি খুবই কম ছিল। বেশি ইনজুরি হলেই আগরতলায় পাঠাতে হতো। তাছাড়া রোগীদেরও স্থান সংকুলান করা যাচ্ছিলো না। ঠিক হলো, হাসপাতাল বড়ো করতে হবে। কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। বিশ্রামগঞ্জে হাবুল ব্যানার্জী নামে এক ভদ্রলোক ও ডা. মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আমরা সেক্টর ৭-এ চলে আসি। ওখানকার মসজিদ আমবাগানে যেয়ে শুরু করলাম কাজ। ডা. মোস্তফা. ডা. মোয়াজ্জেম আর আমরা দুই বোন। আরম্ভ করলাম এডভান্স ড্রেসিং স্টেশন। ছোট বড়ো মিলিয়ে মোট তিনটা ট্যাঙ্ক নিয়ে চলে যেতাম আমরা। মুক্তিযোদ্ধারা আসতো, রক্তের বন্যায় ভেসে যেতো চারদিক। একটা পা উড়ে গেছে, হাত নেই, গুলি লেগেছে বুকে। অথচ তারপরও সে কি উদ্দীপনা তাদের চোখেমুখে। অপারেশন হতো, একটু ভালো হতে না হতেই দেখলাম তারা হাওয়া। চিরকুট রেখে গেছে—'আবার যুদ্ধে যাচ্ছি।' ঐ সময়টায় আমরা বোরখা পরে যেতাম একেক জায়গায়। আহতদের চিকিৎসা করতাম। আর তখনই মনস্থির করলাম—চিকিৎসক হবো।

আজ আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। আমরা দেইও সাক্ষাৎকার। তবুও মনে হয়—আমরা তেমন সাহস দেখাতে পারিনি। শুধুমাত্র কাজই করেছি। সাহসী ছিলেন তারা, যারা দেশের মধ্যে থেকে কাজ করে গেছেন, মুক্তযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন। অনেক অনেক বেশি বৈপ্লবিক মনোভাব ছিল তাদের। আমরা তো সে তুলনায় কিছুই করিনি তেমন।"

তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত 'মুক্তির কথা' প্রামাণ্য চিত্রে দেশের নানা অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের, গারো মুক্তিযোদ্ধাদের নারী নির্যাতন ও গণহত্যার চিত্র তুলে

ধরা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা মইফুল বলেছেন : 'মিলিটারী নগরকান্দা থেকে চান্দের হাটে এসে গুলী করলে গ্রামের মানুষ ঢাল, কাতরা নিয়ে বের হয়েছিল। নারীরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রাম করেন।'[৫২]

বাংলাদেশের নারী সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা বিষয়ে বেশ কয়েকটি বই রচিত হয়েছে। নারী প্রগতি সংঘ প্রকাশ করেছে 'সংগ্রামী নারী যুগে যুগে' ১ম ও ২য় খণ্ড। নিবাদিতা দাশপুরাকায়স্থ প্রিপট্রাস্ট থেকে প্রকাশ করেছে 'মুক্তির মঞ্চে নারী'। এই তিনটি বইয়ে একাত্তরের সংগ্রাম বিষয়ে শতাধিক নারীর অবদানের তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন :[৫৩]

মনোরমা বসু, সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কল্পনা দত্ত, কমলা মুখোপাধ্যায়, আফতাবুননাহার, রাজিয়া খাতুন, নিবেদিতা চৌধুরী (নাগ), সুহাসিনী দাস, প্রীতিরানী দাশপুরকায়স্থ, শান্তি দত্ত, উমরতুল ফজল, যাদুমনি হাজং, বেগম মালেকা আশরাফ, মজিরণ নেছা, হেনা দাস, আরতি দত্ত, জ্যোৎস্না নিয়োগী, বেগম নূরজাহান মুরশিদ, নূরজাহান বেগম, ইলা মিত্র, অনিমা সিংহ, কাজী আজিজা ইদ্‌রিস, সেলিনা বানু, উষাদাশ পুরকায়স্থ, রহিমা চৌধুরী, রওশন হাসিনা, সোফিয়া খান, চিত্রা বিশ্বাস, প্রণতি দস্তিদার, হোসনে আরা ইসলাম বেবী, ডা. ফাতেমা চৌধুরী, সোফিয়া করিম, ডা. হালিমা খাতুন, গীতা সেনগুপ্ত, নূরুননাহার ফয়জেননেসা, সুলতানা সারওয়াত [illegible] জামান, ড. হালিমা খাতুন, ড. সুফিয়া আহমেদ, দীপালী চক্রবর্তী, ড. সন্‌জীদা খাতুন, লতিকা এন মারাক, নূরুননাহার বেলী, নাজমী আরা, সৈয়দা হালিমা রহমান, মাজেদা আলী, বেলা নবী, রনিলা বনোয়ারী, মুশতারী শফি, আমেনা আহমেদ, রমা দত্ত, জান্নাতুল ফেরদৌস, দীপ্তি লোহানী, মতিয়া চৌধুরী, কাজী মদিনা, মালেকা বেগম, ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, মাহফুজা খানম, কাজী মমতা হেনা, মমতাজ বেগম, লায়লা হাসান, লে. (অব.) কনক প্রভা সরকার, দীপা দত্ত (সেন), ডা. ফৌজিয়া মোসলেম, কাজী তামান্না, জিনাতুননেসা তালুকদার, নূরজাহান খান, শেখ হাসিনা, আয়শা খানম, কাজী রোকেয়া সুলতানা, সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন, জিয়াউন্নাহার রোজী, বেবী মওদুদ, সুমিতা নাহা, সামসুন্নাহার ইকো, খালেদা খানম, কাজী রোজী, ফরিদা খানম সাকী, এ. এন রাশেদা, হাজেরা সুলতানা, রাশেদা খানম (রীনা খান), আভা মন্ডল (দত্ত), ফোরকান বেগম, রওশন জাহান সাথী, রাশেদা আমিন, শিরিন বানু মিতিল, নাসিমুন আরা হক মিনু, রোকেয়া কবির, চারুবালা গাঙ্গুলী, ঊষারাণী চক্রবর্তী, ঊষা ব্যাপারী, দৌলতননেছা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, সালেহা খাতুন, জীবনপ্রভা বিশ্বাস, উম্মেহানী খানম, ইতি রানী রায়, মনোয়ারা খাতুন, রানী ভট্টাচার্য, লায়লা সামাদ, জাহানারা ইমাম, মরিয়ম বেগম, নিলুফার আহমেদ ডলি, পুষ্প গুহ, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রোকেয়া মহবুব, সেলিনা খালেক, রেণুকণা বড়ুয়া, জওশন আরা রহমান, ভানু নেছা, রহিমা বেগম, সালেহা আনোয়ার, নেপিশা বেগম, আনিসা করিম, এডলিন মালাকার, রিজিয়া খাতুন, সুফিয়া ইসলাম, রিজিয়া বেগম, ছায়া বসু, অমিতা বসু, সাহারা খাতুন, অঞ্জু গাঙ্গুলী, রওশন আরা বেগম, খাদিজা সিদ্দিকী, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, শামসুন্নাহার, আজাদী হাই, ঝুনু সরকার, শিশির কণা ভদ্র, কল্যাণী ঘোষ, বেগম

শামসুন্নাহার, শেফালী দাস, তাহমিনা মাহবুব, বীথিকা বিশ্বাস, কাঁকন বিবি, রাফিয়া আখতার ডলি, গীতশ্রী চৌধুরী, ফেরদৌস আরা বেগম, নাসরীণ আহমদ, লায়লা পারভীন বানু, আরতি ধর, হান্নানা বেগম, সুলতানা কামাল, জাকিয়া আখতার হোসেন, কৃষ্ণা রহমান, মুকুল মজুমদার দীপা, হাসিনা পারভীন, আমিনা বেগম মীনা, শিরিন জাহান দিলরুবা, আফরোজা হক রীনা, হালিমা খাতুন, মেহেরুন্নেসা মীরা, রাখী দাশপুরকায়স্থ, দিল আফরোজ বেগম, শীলা মোমেন, হালিমা খন্দকার রেণু, মিনারা বেগম ঝুনু, ফরিদা আক্তার, সালেহা বেগম, স্বপ্না দত্ত, শাহীন সামাদ, মমতাজ শেফালী, বকুল মোস্তফা, শিবানী দাস, দীপা ইসলাম, মমতাজ বেগম, তারামন বিবি, কাওসার বেগম, নূরজাহান বেগম, আলমতাজ বেগম ছবি, পদ্মা রহমান, বুলবুল মহলানবীশ, শিরীণ আখতার, নাজনীন সুলতানা, গীতা মজুমদার, রেখা সাহা, সবিতা চন্দ, অলোকানন্দা দাস, ফিরোজা খানম, এস. এম. মনোয়ার বেগম মনু, রোকেয়া বেগম, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, নাজমা শাহীন বেবী, নমিতা ঘোষ।

উল্লেখিত সংগ্রামী নারীদের মত আরও বহু জন রয়ে গেছেন অজানা বা অনুল্লেখিত। ক্রমশ নানা প্রচেষ্টায় বা উদ্যোগের মাধ্যমে হয়তো তাদের কথা আমরা জানবো এবং ইতিহাসে যুক্ত করবো তাঁদের অবদান।

উল্লেখিত নারীদের সাক্ষাৎকার থেকে নানা তথ্য পাওয়া যায়। একটি সাধারণ তথ্য পাওয়া যায় যে, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামে-গঞ্জে চলে যান তাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় পেয়েছেন, প্রয়োজনীয় খাবার, কাপড়, অর্থ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তাঁরা সহযোগিতা করেছেন। কয়েকজনের কথা থেকে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের দুর্যোগময় পরিস্থিতিতেও মহিলারা সংগঠিত হয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওষুধ ও কাপড় সংগ্রহ করে ধানমণ্ডির চার নম্বর রোডের একটি বাড়িতে তারা রেখে আসতেন। অনেকেই বলেছেন তারা অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন বাসায়, প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে যেতেন।

কয়েকজন নার্স ও ডাক্তারের বক্তব্যে জানা যায়, কর্মরত অবস্থায় তারা বাংলাদেশের হাসপাতালে, সরকারি কোয়ার্টারে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসহ লুকিয়ে রেখেছেন, চিকিৎসা করছেন।

মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে আশ্রয় নিয়ে পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করে হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন, এমন অনেক কাহিনীই জানা যায়। কিন্তু এইসব কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত নারীদের কথা ইতিহাসে নেই। বিশেষত নারীদের লেখায় নারীদের কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণার ফলশ্রুতিতে আজ জানা যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ইতিহাস। যেমন জানা গেল পাবনার ভানু নেছার কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। তাদের গ্রামে ঢোকার ব্রিজটি মুক্তিযোদ্ধারা ভেঙে দিলেও পাকসেনারা সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে গ্রামে ঢুকে। মুক্তিযোদ্ধাদের বন্দুক গুলী শূন্য জেনে ভানুনেছা বুদ্ধি করে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক থানা পুলিশের ওসির কাছে গিয়ে গুলী নিয়ে আসেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সাঁথিয়া, সুজানগর, কাশিনাথপুর থানার মুক্তিযোদ্ধারা সেই গ্রামে ছিলেন। তারা সেই গুলী বন্দুকে ভরে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং

সেনাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। ভানুনেছা এমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্থানীয় সকলের কাছেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি সম্মান পাচ্ছেন।

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার চাপ্তা গ্রামে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন রহিমা বেগম। ঢাকা থেকে আত্মীয়-স্বজনরা এসে পড়েন গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে। তার দেবররাও সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের বাড়িতে। এলাকার ডা. নুরুল ইসলামের সাথে কথা বলে তিনি গ্রামের মহিলাদের জন্য নার্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তার মেয়ে মেহেরুন্নেসা মেরী, ননদ রহিমা ও রোমেছা, রওশন আরা, সখিনাসহ তিনি আট নম্বর সেক্টরের ওড়াকান্দিধাম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের সাব ক্যাম্প চাপ্তা ও রাতইলে সক্রিয়ভাবে সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। নানাভাবে সহযোগিতা করা, অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজও তারা করেন। গ্রামের সন্তানদের তারা যুদ্ধে যেতে প্রেরণা দিয়েছেন।

ভাটিয়াপাড়া রণাঙ্গণে যুদ্ধে আহত মুক্তিসেনাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ তারা করতেন।

আইনজীবী সাহারা খাতুন আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে দেশের ভিতরে থেকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বোরখা পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবরাখবর আদানপ্রদান করতেন।

মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার রওশন আরা বেগম তার ছয় মাসের শিশুপুত্রকে মায়ের কাছে রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে চলে গেলেন ভারতের ক্যাম্পে। তার আগে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন গৌরনদীর একটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। ভারতে গিয়ে গোবরা ক্যাম্পে আবারো যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ নিলেন লীনা চক্রবর্তী, যুথিকা চ্যাটার্জি, জিন্নাতুন নেসা তালুকদার (বর্তমানে (২০০১) মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী), কৃষ্ণা রহমান প্রমুখের সঙ্গে।

টাঙ্গাইলের খাদিজা সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকারে জানা যায় মুক্তিযুদ্ধ যখন আসন্ন প্রায় ছিল তখন রাফিয়া আক্তার ডলি, নাজমি আরা রুবি, নিবেদিতা মণ্ডল, খাদিজা সিদ্দিকী প্রমুখ আত্মরক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। অনেকেই তারা টাঙ্গাইল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে যাঁরা জাতীয় পরিষদ সদস্যা হয়েছিলেন তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। বদরুন্নেসা আহমেদ (১৯২৪-১৯৭৪) 'মুজিবনগর মহিলা পুনর্বাসন কার্যকলাপ ও মহিলা সংগঠন মুজিবনগরের' সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট দেয়া, শরণার্থীদের মধ্যে চিকিৎসাসহ ত্রাণসামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণ ও শরণার্থী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা তাঁর প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১৯৭১ সালে নূরজাহান মুরশিদকে ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলে তিনি ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রচার করেন, বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য সমর্থন আদায়ে প্রচেষ্টা চালান। সে সময়ে ভারতের পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখলে পাক সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁকে ১৪

বছরের কারাদণ্ড ও বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দণ্ডাদেশ জারি করেন। উল্লেখ্য যে, তিনিই একমাত্র মহিলা যাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খান এই দণ্ডাদেশ জারি করেন।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (বর্তমানে ২০০১, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী) কলকাতায় পৌঁছান এপ্রিল মাসে। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের কথা বিবেচনা করে নারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর সরকার একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে অর্পণ করা হয়। জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকার গোবরাতে সেই ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল আয়োজন শেষে শুরু হয় নারীদের ফার্স্ট এইড, নার্সিং, মোটিভেশন ও সামরিক প্রশিক্ষণ। তাদেরকে ১৬ জন করে একেকটি দল বানিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে ও হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও নার্সিঙের জন্য পাঠানো হয়।

মুজিব বাহিনীর (বিএলএফ) পূর্বাঞ্চলের বিশালগড় অফিসের দাপ্তরিক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন মমতাজ বেগম। রিভলবার চালনা, সামরিক কৌশল রপ্ত, তথ্য সরবরাহসহ বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন।

রাফিয়া আখতার ডলি মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়মনসিংহ জেলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের তুরা ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি অস্থায়ী সরকারের দেয়া দায়িত্বসমূহ পালন করেন। সেসব কাজ হচ্ছে : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সহায়তায় বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর জন্য খাবার, কাপড় সংগ্রহ করা। শুধু কলকাতায়ই নয়, যশোর বর্ডার এলাকার সব অঞ্চলে যথা বনগাঁ, বারাসাত এলাকায় কাজ করেছেন। কলকাতা পার্ক সার্কাসে 'খাইরুননেসা কল্যাণ সমিতি' গঠন করেন। সেই সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো থেকে সাহায্য সংগ্রহ ও ক্যাম্পসমূহে বিতরণ করা হতো। গোবরা ক্যাম্পের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

৭ ডিসেম্বর যশোর অঞ্চল সর্বপ্রথম মুক্ত হয়। সেদিন যশোরের টাউন হল ময়দানের জনসভায় রাফিয়া আখতার ডলি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন। কণিকা বিশ্বাস, রাজিয়া বানু ও তসলিমা আবেদ—নিজ নিজ অবস্থানে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রীতি রাণী দাস পুরকায়স্থ-এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে[৫৪] জানা যায় সেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক সাবকমিটির প্রতিবেদনে যে, আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অবদান কোন অংশে কম নয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তানী স্বৈরশাসকরা একথা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলো। তাই, একাত্তরে তাদের লেলিয়ে দেওয়া বর্বর সেনারা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের বুকে নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড চালায়।

পশ্চিমা হায়েনাদের উৎপীড়নে অন্য সবার মতো মহিলারাও প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইলা মিত্র, অপর্ণা পাল ও নাদেরা বেগমদের উত্তরাধিকারিরা সেখানে নিশ্চুপে বসে থাকতে পারেন না। তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধে না গেলেও স্নেহ-মমতা-সেবা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধাদের মায়ের অভাব পূরণ করেন। অনেকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে সামনে রেখে অন্যান্য কল্যাণমুখী তৎপরতাও চালান।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মহিলাদের অবদান প্রসঙ্গে 'সেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটি'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এ সংগঠনটি তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট আব্দুল হক (ছাতক-জগন্নাথপুর এলাকা), বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ (ওসমানীনগর, বিশ্বনাথ) ধর্মগুরু প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী (রায়নগর, সিলেট), ভারতীয় খাসিয়া নেতা সেলা মুক্তিফৌজ সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক দেবদাস রায় প্রমুখের উৎসাহে সিলেটের বিশ্বনাথ, ছাতক ও জগন্নাথপুর থানার (শেষ দু'টি এখন সুনামগঞ্জের অন্তর্গত) মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয় এবং 'মহিলা মুক্তিফৌজ' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

মহিলা মুক্তিফৌজ গঠন উপলক্ষে একাত্তরের ৫ই জুলাই সেলা সাব-সেক্টর সদর দফতর মুক্তাঞ্চলের হক নগর (বাঁশতলা)-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রীতি রাণী দাস পুরকায়স্থ (ওসমানীনগর, বিশ্বনাথ)-কে সভানেত্রী, গীতা রাণী নাথকে সহ-সভানেত্রী ও নিবেদিতা দাসকে সম্পাদিকা এবং সুধারানী কর, প্রমীলা দাস, যুথিকা রানী রায়, কানন দেবী (শক্তি), মঞ্জু দেবী, সুষমা দাস, সুনীতি দেবী, শেফালী দাস ও রমা রানী দাসকে সদস্য করে কার্যকরী পরিষদ গঠনসহ যুদ্ধক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে যথাসম্ভব তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার লক্ষ্যে শরণার্থী শিবির থেকে শিক্ষিত মেয়েদের নিয়ে স্থানীয় ডাক্তারদের সহায়তায় সেবিকা দল গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া সভায় গৃহীত এক সিদ্ধান্তে ভারতীয় সমাজসেবিকা অঞ্জলি লাহিড়ীর শিলং থেকে প্রেরিত সকল ওষুধ প্রয়োজন অনুসারে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন শিবিরে প্রেরণের জন্যে হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থের কাছে অর্পণ করা হয়।

পরবর্তীকালে ২৭, ২৮, ২৯ জুলাই, ১, ৮, ৯, ২৫ আগস্ট, ২৫, ৫, ১৫, ২২ অক্টোবর ও ৫ নভেম্বর মহিলা মুক্তিফৌজের ১২টি সাংগঠনিক সভা সংগঠনের সভানেত্রী প্রীতি রানী দাশ পুরকায়স্থের সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২৩ জুলাই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান ও ২২ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (এ পদবী তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন) কর্নেল (জেনারেল) এম.এ.জি. ওসমানী সেলা সাব-সেক্টর পরিদর্শনকালে এর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করেন।

মহিলা মুক্তিফৌজের প্রথম সাংগঠনিক সভায় 'আমাদের কর্তব্য' শিরোনামে ৬টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন, মুক্ত এলাকায় একজন ধাত্রী নিয়োগ ও তার বেতন প্রদানের জন্যে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানানো, কুটির শিল্পের উন্নয়নের

লক্ষ্যে হক নগর এলাকায় অভিজ্ঞ মেয়েদেরকে নিয়োগ, সার্বিক ব্যয় পরিশোধের সুবিধার্থে সম্পাদিকার বিল পেশ, মুক্ত এলাকার গ্রামের মেয়েদের কুটির শিল্প কাজের জন্যে ৫ পাউন্ড সাদা, ৩ পাউন্ড নীল ও ২ পাউন্ড লাল প্লাস্টিক সূতা ক্রয়, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রুষার প্রয়োজনে হক নগরে সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা ও এর ব্যয় হিসেবে প্রবাসী সরকারের নিকট এককালীন ৫ শ' টাকা সাহায্য কামনা এবং কাজের সুবিধার্থে নিবেদিতা দাসকে সাধারণ সম্পাদিকা ও গীতা রানী নাথকে প্রচার ও সাংগঠনিক সম্পাদিকার দায়িত্ব অর্পণ। এছাড়াও অঞ্জলি লাহিড়ীর প্রেরিত পুরনো কাপড় ৩০ জুলাই বন্টন ও পরদিন সভা করে নতুন সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দ্বিতীয় সভায় নতুন সদস্য গ্রহণের ফলে মোট ৪২ জন সদস্য হন।

তৃতীয় সভায় সংগঠনকে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সাহায্য দেয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান (২শ' টাকা), জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট আব্দুল হক (৫শ' টাকা), খাসিয়া নেতা দেবদাস রায় (৫শ' টাকা) ও অঞ্জলি লাহিড়ী (বস্ত্র, ওষুধ ও বিছানাপত্র)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, শিলং থেকে প্লাস্টিক ফিতা, সেলাইর জন্যে কাপড়, রঙ্গিন সূতা, এমব্রয়ডারি ফ্রেম, কাঁচি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে দেবদাস রায়কে একটি তালিকা ও ২শ' টাকা প্রদান এবং এডভোকেট আব্দুল হক, দেবদাস রায়, প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থকে উপদেষ্টা নির্বাচন করা হয়।

এছাড়া আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার লক্ষ্যে একদল সেবিকা তৈরির জন্য ৭ আগস্টের মধ্যে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা জরুরি বলে উল্লেখ করে প্রশিক্ষণ, হাসপাতাল ও কার্যালয়ের জন্য ৩টি কক্ষ, সপ্তাহে ৩ দিন স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সহায়তা ও মুক্ত এলাকায় সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের ৯ জন সদস্যার জন্যে পাস চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানিয়ে নেয়া হয় আরেকটি সিদ্ধান্ত। সব মিলিয়ে ৫টি সিদ্ধান্ত হয়।

চতুর্থ সভায় চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দর সেলা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।

পঞ্চম সভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে গৃহীত সিদ্ধান্তটির মূল বক্তব্য ছিল এইরূপ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে আবদ্ধ। স্বাধীন বাংলার জননায়ককে আটক রাখার কোনো অধিকার পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেই। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধার করে আনবে। এজন্যে প্রয়োজন হলে আমরা পাঞ্জাবের বুকেও রক্তের সমুদ্রে কঙ্কালের পাহাড় তৈরি করতে কুণ্ঠিত হবোনা। আমরা বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ৭ কোটি বাঙালির প্রিয় নেতার প্রতি ইয়াহিয়া খানের কোন অশিষ্ট আচরণ বা বঙ্গবন্ধুর প্রাণের প্রতি হানিকর কিছু ঘটলে মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। যদি এতে বিশ্ব শান্তি বিপন্নও হয় তবু আমরা ক্ষান্ত হবো না। জয় বাংলা।'

ষষ্ঠ সভায় সংগঠনের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী দলকে প্রশিক্ষণ দিতে ২১ আগস্ট থেকে একজন চিকিৎসক নিয়োগের জন্যে সেলা শরণার্থী শিবিরের আঞ্চলিক

ত্রাণ কর্মকর্তাকে অনুরোধ ও নতুন কাপড় এবং ওষুধ দেয়ায় অঞ্জলি লাহিড়ীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কুটির শিল্প কাজের জন্যে ৫শ' টাকার সূতা, কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে অভিজ্ঞ সদস্যাদেরকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কাজের জন্যে সদস্যাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। যেমন প্রশিক্ষণ সেবায় কানন দেবী, উপাসনা রায়, সুধা রানী কর, রমা রানী দাস, মঞ্জু রানী দেবী, কল্পনা রানী নাগ, প্রতিভা রানী দাস, প্রভা রানী দাস, পূর্ণিমা রানী দাস ও নিশা রানী মজুমদার; ধাত্রীবিদ্যায় শেফালী রানী দাস, বেরা রানী কর, শুক্লা রানী দে ও হীরা প্রভা দাস, প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রীতি রানী দাস পুরকায়স্থ, শুক্কা রানী দে, লক্ষ্মী রানী দে, রানী বালা দাস, শৈবালিনী দে, হেমলতা দেব, গীতা রানী নাথ ও মণি রানী দেব, কুটির শিল্পে অনি রানী দাস, মীবা রানী দাস, গৌরী রানী দাস, সন্ধ্যা রানী ঘোষ, মীনা রানী আচার্য, শেফালী রানী দাস, কুসুম রানী আচার্য, কল্পনা রানী ঘোষ, দুলু রানী ঘোষ, শেফালী রানী দাস, আরতি রানী আচার্য, শান্তি লতা চন্দ, সন্ধ্যা রানী দাস, শান্তি রানী ঘোষ ও রেখা রানী দস্তিদার, মুদ্রাক্ষরে আরতি রানী চন্দ, গীতা রানী দাস, বেলা রানী দাস ও নমিতা রানী সরকার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে গায়ত্রী তরফদার, বাসন্তী আচার্য ও রমা রানী দাস। এর মধ্যে কেউ কেউ নতুন সদস্যা ছিলেন। সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৩-এ দাঁড়ায়।

সপ্তম সভায় ভারতের ডেপুটি স্পিকার অধ্যাপক জি.জি সোয়েলের সেলা আগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনা কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রসূতিদের সেবা-শুশ্রুষার প্রয়োজনে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা, ডাক্তার-সেবিকার সংখ্যা বৃদ্ধি, রেশন ও শিশু খাদ্যের মানোন্নয়নের দাবি জানানোর জন্যে ৬টি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অষ্টম সভায় ৫২টি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মধ্যে অঞ্জলি লাহিড়ী প্রেরিত বস্ত্র লটারির মাধ্যমে বন্টন করা হয়।

নবম সভায় সম্পাদিকা নিবেদিতা দাস অসুস্থ অবস্থায় শিলং অবস্থান করায় কানন দেবীকে এ পদের দায়িত্ব প্রদান, অঞ্জলি লাহিড়ী প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ, ১০ জন সদস্যার মাঝে কুটির শিল্পের উপকরণ বন্টন ও ডাক্তারদের সাথে ১৫ অক্টোবর থেকে সেবা প্রশিক্ষণ শুরু, এজন্যে একটি গৃহের ব্যবস্থা (যেখানে আহতদের জন্যে ২টি শয্যা থাকবে) প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্যে প্রীতি রানী দাশ পুরকায়স্থকে অনুরোধ জানানো হয়। সর্বমোট ৪টি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

দশম সভায় যারা আহত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে তারা যাতে শিলং যাবার পথে বিশ্রাম নিতে পারে সেজন্যে একটি গৃহনির্মাণ করে দিতে তরুণ সংঘের সম্পাদক তপন কুমার দাস (লোহারপাড়া, সিলেট)কে অনুরোধ, যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এই সংঘের সদস্যাদের মাধ্যমে থলেতে করে ফোটানো পানি ও মুড়ির নাড়ু পৌঁছানোর প্রয়োজনে এক হাজার টাকা সাহায্য দিতে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সেবা প্রশিক্ষণ দ্রুততার সাথে এগিয়ে নেয়ার জন্যে ডা. দিগেন্দ্র দাশ ও ডা. খলিলুর রহমানকে অনুরোধ জ্ঞাপন করার ব্যাপারে ৩টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী সেলা সাব-সেক্টর পরিদর্শনকালে লিখিতভাবে পরামর্শ দেন, ২য় প্রস্তাবের কপি লেফটেন্যান্ট কর্নেল শওকত আলীর নিকট দিলে তিনি এক হাজার টাকা দেবেন। পরবর্তী সময়ে তা পাওয়া যায়।

একাদশতম সভায় ১২ অক্টোবর বালিউড়া অভিযানে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিকীর পরিবারকে সাহায্য করার জন্যে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী এদিন সেলা সাব-সেক্টর পরিদর্শনকালে এই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মাকে একশ' টাকা সাহায্য হিসেবে প্রদান করেন। এজন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দ্বাদশতম (সর্বশেষ) সভায় অঞ্জলি লাহিড়ী ও ভারতীয় জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত ওষুধপত্র মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার স্বার্থে সেলা সাব-সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ক্যাপ্টেন (মেজর) এম.এ মুত্তালিবের নিকট প্রদান ও কুটির শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী বিক্রির জন্যে শিলংয়ে অঞ্জলি লাহিড়ীর কাছে প্রেরণ, বাঁশতলা মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল ও ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে সত্বর সেবিকাদের যোগদানের সুবিধার্থে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার জন্যে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ জ্ঞাপন এবং মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে শরণার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও গীতা রানী দত্তকে ইছামতি, হেমেন্দ্র দাস পুরকায়স্থ ও প্রীতি রানী দাস পুরকায়স্থকে সেলা ও আরজাদ আলী মিয়াকে ডিংরাই শিবিরের দায়িত্ব দিয়ে ৪টি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইতোপূর্বে ডিংরাই ও ইছামতি শরণার্থী শিবিরে অবস্থানকারীরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এছাড়া সেলা শরণার্থী শিবিরে অবস্থানকারীদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সংগ্রহ, গোলা সরবরাহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণে দিনরাত প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানানো হয়। সেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তিফৌজের এসব সাংগঠনিক সভা দেবদাস রায় ও প্রীতি রানী দাস পুরকায়স্থের বাসভবন এবং স্থানীয় শরণার্থী শিবিরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীদের ভূমিকার কথা বলেছেন বহু গবেষক, লেখক। নানা বইয়ে সেসব কথা সংযুক্ত হয়েছে। গবেষক অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'কথা সাহিত্যের রূপরেখা' বইয়ে উল্লেখিত সাক্ষাৎকার বিবরণীর তালিকা থেকে পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধে কয়েকজনের ভূমিকার কথা। নামের বর্ণনাক্রমিকভাবে তাঁরা হচ্ছেন আখতার ইমাম, উমরতুল ফজল, কমলা মুখার্জী (ভারতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন), চারুবালা বড়ুয়া, জাহানারা ইমাম, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা, মনোরমা বসু, রেণুকণা বড়ুয়া, সুফিয়া কামাল, হেনা দাস।[৫৫]

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা-সংগঠক মুশতারী শফি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন 'স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন।' লিখেছেন সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে 'মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী'। জানা যাবে বহু অজানা নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা এই দুই বই থেকে। মুশতারী শফির ভাষায়:

'চট্টগ্রাম ২৯ মার্চ পর্যন্ত ছিল এখানকার বীর জনতার দুর্বার প্রতিরোধে মুক্ত। তারপর কে কোথায় ছিটকে গেল। শহর ছেড়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় গ্রাম-গঞ্জ প্রত্যন্ত এলাকায়। অনেকে চলে গেল ওপার ভারতে। গঠিত হলো মুক্তিবাহিনী। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। তবে দেশ জুড়ে যুদ্ধ ও পরিস্থিতির কারণে যে যেখানেই যাক না কেন, প্রীতিলতার উত্তরসূরি চট্টগ্রামের নারী শুধু প্রাণভয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকেনি কোথাও। কেউ স্বাধীন বাংলা বেতারে শিল্পী ও শব্দ সৈনিক হিসেবে যোগদান করেছেন। কেউ সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কেউ মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ও হাসপাতালে চিকিৎসা ও নার্সের কাজ করেছেন। দেশের ভিতরে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, শীতবস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়ে, পাকবাহিনীর অবস্থানের খবরাখবর সংগ্রহ করে। মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিয়ে ইত্যাদি নানা রকম দুঃসাহসিক কাজের স্বাক্ষর রেখে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যময়। আর এভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে কত নারী হয়েছেন নিঃস্ব, সর্বহারা। আমি এ গন্থে ক'জনের কথাই বা তুলে ধরতে পারলাম?'[৫৬]

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কসবা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। সেই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মমতাজ বেগমের অবদানের কথা। আব্দুল কাইয়ুম বলেছেন

'মমতাজ আপা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেনদের সাথে যোগ দিয়ে পাক আর্মিদের মুখোমুখি হয়ে সালদা নদী খাদ্যগুদাম থেকে, খাদ্যগুদাম ভেঙ্গে খাবার নিয়ে আসেন। মমতাজ আপা আগরতলা থেকে ডিসি সাহেবকে বলে গাড়ি ম্যানেজ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাংকারে পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। উনি অনেক সহযোগিতা করেছেন। উনি তখন ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য বের হওয়া একজন মহিলা। সে সময় যারা ছাত্র নেতা বা যুবনেতা তাদের সবার সাথে উনার একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল। তাদের সাথে কাজ করেছেন। সৈয়দ রেজাউর রহমান দুই নম্বর সেক্টরের লিয়াঁজো অফিসার ছিলেন যার সাথে থেকে উনি অনেক কাজ করেছেন।[৫৭]

মুক্তিযোদ্ধা ডা. এম.এস.এ. মনসুর আহমেদ বলেছেন :

'আমার মুক্তিযুদ্ধের লাইফ শুরু হলো জুনের শেষের দিকে। বিশ্রামগঞ্জে গেলাম অক্টোবর মাসে। সেখানে দেখলাম ক্যাপ্টেন সিতারাকে, সে মেজর হায়দার সাহেবের বোন। She was a doctor there আর ওখানে নার্সিং সার্ভিস দিত ঢাকা ইউনিভার্সিটির কয়েকজন মেয়ে-সুলতানা কামাল, সাইদা কামাল—কবি সুফিয়া কামালের মেয়ে; শিমুল বিল্লাহ তারপরে পদ্মা রহমান, জাকিয়া আপা, উনি ইডেন কলেজের শিক্ষিকা ছিলেন। আরও ছিল টুলু, নীলিমা, অনুপম, লুলু, খুকু আহমেদ (মেজর আখতার সাহেরব স্ত্রী)। তারপর ছিলেন রেশমা, মিনু, আসমা।'[৫৮]

টাঙ্গাইলে মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে পাকসেনাদের রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম লিখেছেন সে বিষয়ে

'কিউবা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চীন, আলজেরিয়া ও অন্যান্য দেশে মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে মেয়েরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও আমার নেতৃত্বাধীন টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র হাজেরা সুলতানা ছাড়া আব কোন নারীযোদ্ধা ছিলেন না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মায়েরা বোনেরা মুক্তিযুদ্ধে তাদের কোন ভূমিকা বা অবদান রাখেন নি। তাদের অমূল্য অবদান না থাকলে আমরা এত তাড়াতাড়ি সফল হতে পারতাম না। আমার এবং অন্যান্য প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে মা-বোনেরা মনপ্রাণ দিয়ে সব সময় সেবা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার ব্যাপারে বলতে গেলে শতকরা নব্বই ভাগ দায়িত্বই মা-বোনেরা নিয়েছেন। এছাড়াও চরম সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানে মেয়েদের ভূমিকা ছিল সব চাইতে বেশি। প্রত্যক্ষভাবে নারীসমাজ টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করলেও তারা মুক্তিযুদ্ধের অর্ধেক দায়-দায়িত্ব বহন করেছেন।'[৫৯]

'মেঘালয়ের তুরাতে 'রওশন আরা' ক্যাম্প নামে মুক্তিবাহিনীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছিল। ঢাকার বোন রওশন আরা বুকে মাইন বেঁধে হানাদাব বাহিনীর ট্যাঙ্কের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে দশ-বারজন হানাদারবাহী ট্রাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছিল। তার স্মৃতি, সাহস ও উদ্দীপনাকে সমুজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যেই এই প্রশিক্ষণ এলাকার নামকরণও করা হয়েছে রওশন আরা নগর।'[৬০]

রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম লিখেছেন :

'অবশেষে এসে পড়ে ডিসেম্বর মাস। প্রতিটি সেক্টরে প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানীদের প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে পড়ে, দ্রুত পশ্চাৎপসারণ করতে থাকে ওরা। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলে যৌথ বাহিনী, মাতৃভূমিকে হানাদার বাহিনীর হিংস্র ছোবল থেকে মুক্ত করতে দৃপ্ত শপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা। সবার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার উদ্দামতায় ছুটে চলে বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ—নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী-শিশুরাও।'[৬১]

নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধা সুরুজভান (বানু) সম্পর্কে খুরশীদ জাহান লিখেছেন

একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে গ্রামেগঞ্জে তার ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে। শহর-গ্রামের দামাল ছেলেরা যেমন করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে, গেরিলা আক্রমণ করে দেশকে পাকিস্তানী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে জীবনপণ দ্বিধা করেনি, তেমনি বহু মহিলাও লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে যুদ্ধের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করতে কম সাহায্য করেনি। তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা নেই কত নাম না জানা অচেনার ভিড়ে তারা মিশে আছে বাংলার বুকে। এরকমই একজন সাহসী মহিলা নরসিংদীর পলাশ থানার নোয়াকান্দা গ্রামের সুরুজভান (বানু)।[৬২]

১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ ঢাকায় কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিবেক শাণিত করে কাজ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন

'সায়েন্স ল্যাবরেটরির কলোনির মধ্যে কিংবা বাইরে যারা কথা বলেছে—বলেছে দৃঢ়কণ্ঠে অথচ ফিসফিসিয়ে। কারণ, তখন মৃতপ্রায় এই শহরে, একমাত্র জেগে থাকা গেরিলা অপারেশনের যোদ্ধা ছেলেদের অপেক্ষায়, যাঁরা বোমা ফাটিয়ে কাঁপিয়ে দেবে শহরটাকে অথবা কানের কাছে ট্রানজিস্টার রেখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে

স্বপ্নগুলোকে তারার মতো ফ্টিয়ে রাখা, যারা মৃতপ্রায় এই শহরের বুকটা আলোকিত করে। বাংলা একাডেমীর অফিস ঘরে খাকি পোশাক পরা রাওফরমান আলীকে দেখে রক্ত গরম হয়ে ওঠা, বুকের ভেতরের ঝনঝন শব্দ নিয়ে তাকিয়ে থাকা। প্রয়াত কবি হুমায়ুন কবিরের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে মাসিক চাঁদা ধরিয়ে দেওয়া।'[৬৩]

মুক্তিযোদ্ধা বৌদ্ধ নারীদের সম্পর্কে প্রণব কুমার বড়ুয়া লিখেছেন :

১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি বৌদ্ধদের গৌরবময় অবদানের আজও মূল্যায়ন হয়নি। সত্যিই বাঙালি বৌদ্ধেরা আজও তাঁদের ভূমিকার স্বীকৃতি পায়নি। নিম্নলিখিত মহিলারা কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও প্রগতিশীল আন্দোলন এবং ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন

শ্রীমতি ননীবালা বড়ুয়া, রাউজান থানা, প্রতিভা মুৎসুদ্দী, করুণা বড়ুয়া, ডা. রেণুকণা বড়ুয়া, সুনীতি বড়ুয়া, অজিতা বড়ুয়া, অনিমা বড়ুয়া।[৬৪]

মুক্তিযোদ্ধা নারীদের অবদানের বিবরণ-তথ্যাদি এখনও আবিষ্কৃত হচ্ছে। অবহেলিত বিস্মৃত এই ইতিহাস পুনর্লিখনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

তারেক মাসুদ, ক্যাথরিণ মাসুদ তৈরি করেছেন দু'টি প্রামাণ্য চিত্র ১. মুক্তির গান, ২. মুক্তির কথা। মুক্তিযোদ্ধা নারীদের প্রামাণ্য বিবরণ এই দুই চলচ্চিত্রে আছে। মুক্তির কথা চলচ্চিত্রের (পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি) মাধ্যমে জানা যাচ্ছে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা রাবেয়া, মাইফুল, সুফিয়া, হামিদা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ারা বেগম, শরণার্থী (বালিকা) স্মৃতিরেখা বিশ্বাস প্রমুখ নারীদের কথা। মুক্তিযোদ্ধা মাইফলের কথা :[৬৫]

'মেলেটারী আমাগো গ্রামে গুলি করবার আরম্ভ করল। এইতো আমাগো গ্রামের মানুষ বাইরাইলো ঢাল, কাতরা লইয়া। আমিও বাইরাইছিলাম। কত পানি নিয়া বাইরাইয়া বিটাগো খাওয়াইছি। তারাতো দাবরাইতে দাবরাইতে হয়রান হইয়া গেছিলো। হগল্তা লইয়াও বাইরাইছিলাম। লইয়া আউগাইয়া আউগাইয়া দিছি, কত চড়া, কান্দা, ঢাল, কাতরা, নাড়ি, ঠ্যাঙ্গা, সবতা আউগাইয়া আউগাইয়া দিছি।'

ঢাকার গেরিলাযোদ্ধা বোনদের কথা হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ লিখেছেন

ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলে এক অ্যাকশনের প্রয়োজনে স্কুলের ভিতর অস্ত্র বহন করার দায়িত্ব পালন করেন এক ছাত্রের মা। রাজাকার-আর্মির পাহাড়া এড়িয়ে বোরখার নিচে অস্ত্র বহন করে স্কুলের ভিতর গেরিলা যোদ্ধাদের পৌঁছে দেন একজন মা। মগবাজার ওয়ারলেস এলাকার চার গেরিলা ভাইদের এক বোন সুরাইয়া আক্তার বেবী গোলাবারুদ হাতে পাক আর্মির সাথে লড়াইয়ে গেরিলা অ্যাকশনে যোগ দেন। ১৬ ডিসেম্বর অ্যাকশন করা অবস্থায় পাক আর্মির গুলিতে শহীদ হন।[৬৬]

টাঙ্গাইলের গেরিলাযোদ্ধাদের সহায়ককারী জয়নাব বেগমের কথা বিমান বিহারী দাস বলেছেন

টাঙ্গাইলের তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এডভোকেট সোহরাওয়ার্দী বলেন, ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের সেতু ধ্বংসের আগে এর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করি। এ কাজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৌরসভার ভ্যাকসিনেটর জয়নাব বেগম আমাকে সহায়তা করেন।[৬৭]

ঝিনাইদহের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নারীদের বিষয়ে কমল সাহা বলেছেন

১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর। এ সময় ঝিনাইদহের কামান্না ছিল মুক্ত এলাকা। মাধব চন্দ্র ভৌমিকের টিনের চাল ও টিনের বেড়া বিশিষ্ট গুদামঘরে ছিল ৩২ জন এবং পাশেই ছামেনা বেগমের দুটি খড়ের ঘরে ছিল ১০ জন। স্থানীয় রাজাকারদের গোপন তৎপরতায় আর্মি চলে আসে। ছামেনা বেগম ও মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবিদ্ধ হন। ছামেনা বেগম প্রাণে বাঁচেন কিন্তু গুরুতর আহত হন। ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। তাদের সাথে মারা যান মুক্তিযোদ্ধাদের কাজের মেয়ে রঙ্গবিবি।[৬৮]

সিলেটের চা-বাগানের চা-নারী শ্রমিকরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম কলেজপড়ুয়া (১৯৬৭) দু'জন ছাত্রী তৃপ্তি বুনারজি ও সন্ধ্যারাণী বসাক যুদ্ধ করেছেন লক্ষ্মীছড়া চা বাগানে। দেশেই ছিলেন, বাগানেই ছিলেন মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে। এখন তারা সরকারি কর্মচারি।[৬৯]

মুক্তিযোদ্ধাদের জবানবন্দীতে লেখা বহু দলিলে-বইয়ে গেরিলা যুদ্ধের নানা ঘটনার বর্ণনা আছে। গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাইল, খুলনাসহ দেশের নানা অঞ্চলে শহর ও গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ করেছেন। তারা আত্মগোপনে থেকেছেন, অ্যাকশন করেছেন যেখানে যেখানে-সেসব জায়গায় মহিলারা সর্বাত্মকভাবে যুক্ত ছিলেন। মহিলাদের সাহায্য ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ চালানো বাস্তবে সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা হারুণ হাবিব লিখেছেন 'মুক্তিযোদ্ধা রবিউল যখন আহত হন তখন গ্রামের গৃহবধূরা সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও গৃহস্বামীরা দরোজায় দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করেছিলেন।'[৭০]

গেরিলা যুদ্ধের জন্য মেয়েরা সবরকম প্রস্তুতি, কষ্ট মোকাবিলা করেছেন। তাদের গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি না দেয়ার সমস্যা নারী সমাজের প্রতি আমাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি জাত সমস্যা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 'যোদ্ধা' পরিচিতির সাথে 'পুরুষ'-একাধিপত্যকে প্রধান দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এ জন্য দায়ী। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সর্বত্র গেরিলা যোদ্ধাদের পাশে ছিলেন নারীসমাজ। তারাও ছিলেন অকুতোভয় গেরিলা যোদ্ধা।

সূত্র

১. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *একাত্তরের বিজয়গাথা,* ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ভূমিকা IX।
২. ফরিদা আখতার সম্পাদিত, *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা,* ঢাকা, নারীগ্রন্থ, ১৯৯১, পৃ. ৪৪-৪৬।
৩. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, রক্তাক্ত বাংলা, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭১-১৯৮৯, পৃ. ১৭৮।
৪. ঐ, পৃ. ২০১।
৫. আবুল ফজল, দুর্দিনের দিনলিপি, ঢাকা, মুক্তধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ৫২, ২১৩।
৬. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।
৭. সরদার ফজলুর করিম, রুমির আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৫-১৬৮।
৮. বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা, একাত্তরের স্মৃতি, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।
৯. রাবেয়া খাতুন, একাত্তরের নয়মাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৫।

১০. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ২৭।
১১. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
১২. সেলিনা হোসেন, ঢাকা, একাত্তরের ঢাকা, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৩২।
১৩. সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়রী, ঢাকা, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৫।
১৪. সাক্ষাৎকার, খালেদা জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের দলিল।
১৫. শেখ হাসিনা, বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০২, এবং আনু মাহমুদ, গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা, ঢাকা, স্বরাজ প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৫৪-৬৬
১৬. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৭-১৯০।
১৭. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস ২য় খণ্ড, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃ. ৭৭-৭৮।
১৮. মালেকা বেগম, নির্ঝর মিশেছে তটিনীর সাথে, ঢাকা, দৈনিক সংবাদ, ২৬.৬.৮২।
১৯ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪ ১২ খণ্ড, পৃ. ৩০১।
২০. ঐ, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৬৯১-৬৯৪।
২১. ঐ
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. মুনতাসীর মামুন, সেই সব দিন ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮।
২৫. সুফিয়া কামাল, প্রাগুক্ত।
২৬. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
২৭. বেগম মুশতারী শফী, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী, চট্টগ্রাম, প্রিয়ম প্রকাশনী, ১৯৯২
২৮. ঐ
২৯. প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), কথ্য সাহিত্যের রূপরেখা, ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ১৯৯১, পৃ. ১০৭।
৩০. সরদার ফজলুল করিম, প্রাগুক, পৃ. ১৫০।
৩১. হারুন হাবিব সম্পাদিত, *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ,* ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১৫২।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।
৩৩. ঐ
৩৪. নয়-নীলিমার নীল কাহিনী, রবিউল হুসাইন, সংকলিত, হারুণ হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।
৩৫. ঐ
৩৬. প্রাগুক্ত, রাশেদা কে চৌধুরী, পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা।
৩৭. রাবেয়া খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ও ৫৫।
৩৮. মুসা সাদিক, মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম, ঢাকা, প্রকাশক হাবিবই আকবর মেহমুদ ও মায়মুন হাসিবমুনাজ, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১।
৩৯. মুসা সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
৪০. ঐ
৪১. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৪২ মিলান ফারাবী, ঢাকা, দৈনিক বাংলাবাজার, ১৩.১.৯৬।
৪৩. সংগ্রামী নারী যুগেযুগে ২য় খণ্ড, নারীপ্রগতি সংঘ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৯-১৬১।
৪৪. মোয়াজ্জেম হোসেন, অকুতোভয় দুই মহিলা মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড চার্জ করে উড়িয়ে দিলেন, ঢাকা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।
৪৫. ফোরকান বেগম, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৪৬. কাজী রাশিদা আনওয়ার, ঢাকা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৮।
৪৭. শাহআলম গনি, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি, ঢাকা, প্রথম আলো, ২৬ মার্চ ১৯৯৯।
৪৮. ভোরের কাগজ প্রতিবেদক, ঢাকা, ২০ এপ্রিল ১৯৯৯।
৪৯. নাসির আহমেদ. ঢাকা, জনকণ্ঠ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
৫০. গুলশান আখতার, ঢাকা, জনকণ্ঠ ৪.১২.৯৬।

৫১. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১১.১২.৯৬। ফজলুল বারী, ঢাকা, জনকণ্ঠ ১৫ জুন, ১৯৯৯।
৫২. তারেক ও ক্যাথরিক মাসুদ, মুক্তির কথা প্রামাণ্যচিত্রের বুকলেট, ঢাকা, ১৯৯৯।
৫৩. সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত এবং নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তির মঞ্চে নারী, ঢাকা, বিপট্রাস্ট, প্রাগুক্ত।
৫৪. আল-আজাদ, একাত্তরের সিলেট, অন্যরকম যুদ্ধ, ঢাকা, আদৃতা প্রকাশনা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪-৩৯ এবং অঞ্জলি লাহিড়ী, স্মৃতি ও কথা ১৯৭১, ঢাকা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ১৯৯৯।
৫৫. প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫-১৮।
৫৬. বেগম মুশতারী শফী, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৫৭. মঈদুল হাসান, সুকুমার বিশ্বাস, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধে কসবা, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫-৩৬।
৫৮. ঐ, পৃ. ২০৯।
৫৯. কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, স্বাধীনতা '৭১, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৪৪৭।
৬০. ঐ, পৃ. ৩৭১।
৬১. রহীমশাহ সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধ পঁচিশ বছর, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৬৬।
৬২. ঐ, পৃ. ২৭৬।
৬৩. ঐ, পৃ. ২৭৩।
৬৪. প্রণবকুমার বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৩০, ৬০, ৬৭।
৬৫. তারেক ও ক্যাথেরিন মাসুদ, মুক্তির কথা, ঢাকা, (প্রামাণ্য চলচ্চিত্র) ১৯৯৯।
৬৬. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, স্বাধীনতা সংগ্রাম ঢাকায় গেরিলা অপারেশন, ঢাকা, ঢাকা নগর যাদুঘর, ১৯৭২, পৃ. ৭২-৭৪।
৬৭. মুনতাসীর মামুন, একাত্তরের বিজয় গাথা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ১০।
৬৮. ঐ
৬৯. দীপংকর মোহান্ত, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, মে, ২০০০, পৃ: ১০১-১০৩; ১০৫-১০৭।
৭০. হারুন হাবিব, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১, পৃ. ৮২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র-নারী সংগঠকরা নানাভাবে সংগঠিত হতে থাকেন। সে ইতিহাস নানা সূত্রে জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই সব সংগঠিত দলের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের বাঁচিয়ে রাখা, ট্রেনিং দেওয়া, কাজে যুক্ত করা, মুক্তিযুদ্ধের জন্য রিক্রুট করার পরিকল্পনা অনুযায়ী মহিলা ও ছাত্রী কর্মীদের বিপুল বিশাল দলকে ভারতে সংগঠিত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচিত সদস্যদের সরকারের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের মন্ত্রীপরিষদে তখন জাতীয় পরিষদের মহিলা সদস্যদের যুক্ত করা হয়নি। নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী দলের প্রতিনিধি হিসেবে ৩ জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য নূরজাহান মুরশিদ। ২৫ মে প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে নূরজাহান মুরশিদ নয়াদিল্লীতে যান এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উভয় দেশের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি দলের সদস্যদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে সফর করেন ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেন। পরবর্তীতে মুজিবনগরে ফিরে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট প্রদান করেন।[১]

জাতীয় সংসদ সদস্য শ্রীমতী কনিকা বিশ্বাস তার সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়ানী থানার ওড়াকান্দি গ্রামে ছিলেন ২৫ মার্চ। সেখানে পাক সেনাদের সশস্ত্র আক্রমণের খবর জেনেছেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী জুলাই মাস পর্যন্ত গোপালগঞ্জ মহকুমার নানা অঞ্চলে অবস্থান করে আওয়ামী লীগ কর্মী ও যুবকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। মে মাসের মধ্যে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা শক্তিশালী হন এবং ৫ মে গোপালগঞ্জ থানা ছাত্রলীগকে নেতৃত্ব দিয়ে থানা আক্রমণ করেন। থানা ইনচার্জ নিহত হয় এবং ৮২টি রাইফেলসহ গোলাবারুদ তারা সংগ্রহ করেন। তবে ক্রমশই পাক সেনারা শক্তিশালী হয়ে এসব এলাকায় আক্রমণ শুরু করে এবং গণহত্যা চালায়। তখন সংগঠকরা ও গেরিলা যোদ্ধারা ভারতের পথে যাত্রা করেন। মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠাকুরনগর, সল্টলেক, হাসপুর সায়া, হেলেঞ্চা, খড়ের মাঠ প্রভৃতি স্থানের শরণার্থী শিবিরে কনিকা বিশ্বাস সেবা কাজ পরিচালনা করেন।[২]

জাতীয় সংসদের (মহিলা আসন-৬) সদস্যা মমতাজ বেগম সাক্ষাৎকারে বলেন, ২৫ মার্চ ছিলেন তিনি ঢাকার গেন্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডের বাড়িতে। ১ এপ্রিল কুমিল্লায় যান। কসবায় অবস্থান করে আনসার ও স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৭ এপ্রিল যখন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তখন মুজিবনগরে মহিলা সদস্যদের মধ্যে একমাত্র মমতাজ বেগম উপস্থিত ছিলেন। অন্যেরা তখনও পৌঁছাননি। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয়ের জন্য সম্ভাব্য সহায়তা তিনি দিয়েছেন। মহিলাদেরও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। মহিলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহানারা হক এই সংগঠনের সভানেত্রী এবং ফরিদা মহিউদ্দিন সেক্রেটারি মনোনীত হন। সেখানে মেয়েদের নার্সিং শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ক্যাম্পে তারা ত্রাণ কাজও করেছেন।[৩]

আগরতলা ক্রাফট হোস্টেলে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতিবাদী সকল সংগঠক নারী পুরুষরা ক্যাম্প বানিয়ে ছিলেন। বেগম মুশতারী শফী তার বই-এ এই সংগঠক মেয়েদের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। মতিয়া চৌধুরী, সেলিনা বানু, মালেকা বেগম, আয়শা খানম, ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, ডা. ফওজিয়া মোসলেম, ফরিদা আক্তার, মুনিরা আক্তার, রোকেয়া বেগম, মিনি মর্জিনা, মিসেস রউফ, ঢাকার চারুকলার লাইব্রেরিয়ান জাহানারা বেগম, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি কলেজের অধ্যাপিকা লক্ষ্মী রানী আইচ প্রমুখ সকলেই বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ করেছেন। জিভি হাসপাতালে এরা ফার্স্ট এইড ট্রেনিং নিয়েছেন, ক্যাম্পে ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ওয়ার্ডে সংহতি জানিয়ে কাজ করেছেন। সাবরুম বর্ডারে পাকসেনাদের বাংকার থেকে উদ্ধার পাওয়া নির্যাতিত মেয়েদের হাসপাতালে সেবা করেছেন তারা।[৪]

এই ক্যাম্পের বাইরে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যরা মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়কালে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোরমা বসু, হেনা দাস, শান্তি দত্ত। মহিলাদের আগরতলা ও কলকাতায় সংগঠিত করে কাজে যুক্ত করেছিল আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, শিক্ষক সমিতি, শিল্পী সমিতি, বেতার শিল্পী সমিতি, সঙ্গীত শিল্পী সমিতি। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা এবং সংসদ সদস্য বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ এপ্রিল মাসে আগরতলা পৌঁছান। ভারতে আশ্রয় প্রার্থী বাংলাদেশী শরণার্থীদের সাময়িক পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা ও বাসস্থানসহ নানা প্রকার ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিলি বণ্টন করার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। মুজিবনগরে মহিলা শরণার্থীদের মধ্যে বাছাই করা কার্যক্ষম তরুণীদের নার্সিংসহ নানা প্রকার যুদ্ধ উপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের হাসপাতালে সাহায্য করার ব্যবস্থা করেন। শরণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পে খাদ্য, বস্ত্র (গরম) ওষুধ ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ ভারতে বাঙালি আশ্রয় প্রার্থীদের সাময়িক পুনর্বাসনের জন্য বেগম বদরুন্নেসা সংগঠকের কাজ করেছেন।[৫]

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সংগঠক কর্মী, নেতৃবৃন্দের পরিবারের স্ত্রী, মেয়েরা যে যে রকম ভাবেই হোক না কেন সংগঠকের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছেন। সে সব তথ্য ছড়িয়ে আছে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে কখনো 'স্ত্রী' শব্দ বা 'নাম'-এর উল্লেখ মাধ্যমে। বেগম সাজেদা চৌদুরী ছিলেন মেয়েদের ট্রেনিং দেয়ার একমাত্র ক্যাম্প গোবরা ক্যাম্পের পরিচালক সংগঠক। আইভী রহমান শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।[৬]

মেজর জলিল একটি নারীবাহিনী তৈরি করেছিলেন।[৭] ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাকপর্বে যারা সংগঠকের কাজ করেছেন পরোক্ষভাবে তাদের অনেকের মধ্যে ছিলেন সালমা ইসলাম ও সুলতানা মান্নান। ড. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা লিখেছেন তাদের সাংগঠনিক কাজের কথা।[৮] ২৫ মার্চের পর তারা ঢাকা থেকে যান গ্রামে। নানা সংকট সমস্যার মধ্যে সীমান্ত পেরিয়ে যান এপ্রিল মাসে। সুলতানা জামান যোগ দেন ক্যাম্পের হাসপাতাল সংগঠকি করার কাজে। বহু মেয়েদের নার্সিং-এর কাজে ট্রেনিং দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের নাসিং এর কাজে যুক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে ভারতীয় মহিলাবৃন্দের সহযোগিতায় ও সাহিত্যিক মৈত্রেয়ী দেবীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা খেলাঘর নামের ছিন্নমূল বাংলাদেশের শিশু সংগঠনের কাজে যুক্ত হন সুলতানা জামান। ঢাকা থেকে সংস্কৃতিমনা যে ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তারা দুটি ব্রত নিয়েছিলেন ১. একটি গানের স্কোয়াড তৈরি করা। ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রচার করার জন্য কাজ করা। ২. বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে শরণার্থীদের উজ্জীবিত করা। সালমা ইসলাম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ প্রাক্কালে সাংস্কৃতিক তৎপরতার সংগঠক কর্মী তাই তাকেই এই স্কোয়াডের মেয়েদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হলো। এরা নিজস্ব উদ্যোগে, স্বেচ্ছাসেবী কাজ করেছেন। সান্‌জীদা খাতুন ছিলেন অন্যতম শিল্পী সংগঠক। ওয়াহিদুল হক, মুস্তফা মনোয়ার, হাসান ইমাম, লায়লা হাসান, বেনু, শাহীন, ডালিয়া, লায়লা, লুবনা, শীলা, শর্মিলা আরও বহু শিল্পীকে সংগঠিত করার কাজ তিনি করেন।

মেঘালয়ে আশ্রয় নেন নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ। এক পর্যায়ে মেঘালয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জনমত গঠনের লক্ষ্যে প্রচারের জন্য সাংস্কৃতিক দল তারা গঠন করেন। গীতি নকশা লেখা। অনুষ্ঠান সংগঠিত করার কাজ করতে করতে এদের ডাক আসে দুই নম্বর সেক্টরের অধীন কাছাড় জেলার করিমগঞ্জের শম্ভু সরকারের ধারে স্থাপিত বেইস ক্যাম্পে। কর্মী ও নেতাদের সেই ক্যাম্পে নিবেদিতা, মনীষা চক্রবর্তী এরা কাজ করেন। হাসপাতালে নার্সিং-এর কাজ, ক্যাম্পে রান্নার কাজ করেছেন ওরা। অক্টোবরে এরা যান কলকাতায়। সেখানে ছিলেন আরও কর্মী সংগঠক খোদেজা কিবরিয়া, ষোড়শী চক্রবর্তী, ঊষা দাশ পুরকায়স্থ (সিলেট জেলা মহিলা পরিষদের সভানেত্রী) খুশী দেব, নীনা চৌধুরী, রাহেলা, সুরাইয়া রাজা, তাহেরা সিরাজ, রঞ্জু লেখা দত্ত চৌধুরী, রাখী দাশ পুরকায়স্থ প্রমুখ।[৯]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি খবর পড়তেন পারভীন হোসেন ও নাসরীন আহমাদ শিলু—তবে ছদ্মনামে দেশের ভিতরের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিরাপত্তার

কারণে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। গানের শিল্পী সময়ের প্রয়োজনে হলেন খবর পাঠিকা। গানও গাইতেন। এই কাজে আরও অংশগ্রহণকারী সংগঠক ছিলেন কল্যাণী ঘোষ, উমা, স্বপ্না রায়, বুলবুল মহলান বীনা, অমিতা বসু, ফ্লোরা আহমেদ, ফেরদৌসী মজুমদার প্রমুখ।[১১]

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে প্রবাসে লন্ডন, আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। নারী সমাজের ভূমিকা উলেখযোগ্য। ৩ এপ্রিল প্রবাসী বাঙালি মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিল লন্ডনের রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রচার আন্দোলন গঠন করেন তারা। বিভিন্ন দুতাবাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।[১১]

২৪ এপ্রিল বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা এসে সভা করেন। লুলু বিলকিস বানু সভানেত্রী হন। পয়লা মে উলস্টার শহরে পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের প্রথম ম্যাচের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি নারী পুরুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটির প্রবাসী সুরাইয়া খানম বাংলাদেশের সমর্থনে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন। বাংলাদেশ গণ সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মুন্নি রহমান সংগঠক হিসাবে ভূমিকা রাখেন।[১২]

ওয়াশিংটনে ২৩ মার্চ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এনায়েত করিম সাহেবের বাড়িতে সমবেত হন প্রবাসী বাঙালিরা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সংহতি জানাবার জন্য তারা সংগঠক গড়ে তোলেন। সেদিন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা এবং একটি কেক বানিয়ে নিয়ে যান মিসেস আসমা কিবরিয়া। ২৭ মার্চ বিকেলে ওয়াশিংটনের বাঙালি সমাজের ৭০ জন স্ত্রী, কন্যা, পুত্র নিয়ে আবুল আল আবদুল মুহিতের বাসায় হাজির হন।

জুন-জুলাই মাসে বাঙালি মার্কিনরা মিলে গড়ে তোলেন, 'ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল' বাংলাদেশের জন্য প্রচার, বাংলাদেশের জন্য সমর্থন আদায়, মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। সংগঠকদের মধ্যে হোসনা করিম, ফরিদা হক, সুলতানা আলম, রওশন আরা চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। খাদিজা হক, পুতুল, নাজমা এরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কাজের সমর্থক।

বাংলাদেশের সংগ্রামী নেত্রী আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬) নিউইয়র্কে ছিলেন বিশ্বব্যাংকে কর্মরত ছেলে সমর সেনের বাড়িতে। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসীদের সংগঠিত করেন। তিনি বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ভবনে প্রতিবাদ জানান, অনশন করেন।[১৩]

মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছে দেশে-সীমান্তে-ভারতে-প্রবাসে তখন বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের ভয়াবহ পাশবিক ঘটনাও ঘটছিল ব্যাপকভাবে। পাকবাহিনীর বাংকারে, বন্দী শিবিরে, রাজাকারের হাতে নারী নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। মুক্তিযোদ্ধা কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দেশের ভিতরে বেশ কয়েকজন সচেতন মহিলা সংগঠক গড়ে তোলেন উদ্ধার কাজ। এদের মা, বাবা, অভিভাবক, পরিবার,

স্বামী, স্বজন কেউ প্রকাশ্যে এগিয়ে আসেননি। এদের উদ্ধার করার এই উদ্যোগটাই পরে, 'নারী পুনর্বাসন সংস্থা' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এও ছিল মুক্তিযুদ্ধ। রাজনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের পর্ব যদিও ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত—কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের পর্ব শুরু হয় ডিসেম্বর শেষ হয় এদের পুনর্বাসনের পর, চলছে এখনও।[১৪]

এই কাজের সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন পরিচালক মালেকা খান, সংগঠক বদরুন্নেসা আহমেদ, মেহের কবীর, বাসনা হাজারী, ড. হালিমা খাতুন, শিল্পী সুফিয়া শহীদ, বেগম শামসুন্নাহার। ফিরোজা খাতুন এবং আরো বহু ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবিকা, সমাজকর্মী, গৃহিণী। সব পেশার সচেতন নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন।

'৭১-এর নারী নির্যাতন সৃষ্টি করেছিল অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভের সন্তান সমস্যা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই এর উদ্ভব। উদ্ধার করতে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের। চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করতে হয়েছে। এক বছরের মধ্যে সংসার পরিত্যক্ত ৫০০০ মেয়ের ঠিকানা হলো ২০ নং ইস্কাটন, ঢাকা। বহু মেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, কাঁদতো, চিৎকার করতো, আবার চুপ হয়েও থাকতো। এদের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়ার আপ্রাণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন সংগঠকরা।

প্রত্যেকের কাহিনী এই সংগঠকরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু যখন মেয়েদের পুনর্বাসন হলো তখন সেই বিবরণগুলো পুড়িয়ে ফেলা হলো।

সংগঠকরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাগ্রহে ইচ্ছুকদের হাতে তুলে দিলেন নির্যাতিত নারীদের নবজাত সন্তান। কবি সুফিয়া কামাল সাক্ষাৎকারে বলেন 'গর্ভপতি করা গিয়েছিল কিছু সংখ্যকের। বহু নারীকে জন্ম দিতে হয়েছে যুদ্ধ শিশু।'[১৫] মালেকা খান বলেছেন নির্যাতিতদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুটো আইন করেছিলেন ১. ধর্ষিতার জন্য গর্ভপাত আইন। ২. যুদ্ধ শিশুদের জন্য আন্তঃদেশ শিশু দত্তক আইন। মাদার তেরেসার দায়িত্বে তুলে দেয়া হয়েছিল অসংখ্য যুদ্ধ শিশুকে।

এই সংগঠকরা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশের বহু ব্যক্তিত্বের সাহায্য পেয়েছেন, চাকরি দিয়েছেন অনেকের। রেডক্রসের মাধ্যমে, কামরুল হাসানসহ বহু উদ্যোগী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মেয়েরা সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করলো যুদ্ধোত্তর সংকট। সংগঠকরা সে সময় পাকবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন। পরে মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আর চেষ্টা করেননি। সরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছিল নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র। সংগঠক ছিলেন ড. নীলিমা ইব্রাহিম, সাজেদা চৌধুরী, মোশফেকা মাহমুদ। জাস্টিস কে এম সোবহান ছিলেন মূল দায়িত্বে। এই সংগঠকরা সরকারি উদ্যোগকে সফল করেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের প্রত্যেকের জন্য ২০০০ টাকার অনুদান বরাদ্দ করেছিলেন বাংলাদেশ সরকার।

মুক্তিযুদ্ধের গবেষক, সাহিত্যিকরাও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা।[১৫]

সাহিত্য সাধনায় রত বাংলাদেশের মহিলারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, সাহিত্য রচনা করেছেন। এই সব লেখালেখিতে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের

বিবরণ ও অভিজ্ঞতা। সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম, জাহানারা ইমাম, রাবেয়া খাতুন, রিজিয়া রহমান, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা হোসেন, খালেদা সালাহউদ্দিন, মালেকা বেগম, শ্যামলী চৌধুরী, পান্নকায়সার বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, বেগম, মুশতারী শফী, সাহিদা বেগম, হেনাদাস, আখতার ইমাম, সুলতানা কামাল, উম্মে হাবিবা, আয়শা বানু, নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, ফরিদা আক্তার, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা প্রমুখ। বহু গবেষক সাহিত্যিক-এর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে '৮০-র দশক থেকে। নাট্যকার, উপন্যাসিক কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে নারী ব্যক্তিত্বদের গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি নেই।

যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বিবরণে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কালীন তাৎক্ষণিক ঘটনা, বিশ্লেষণ নেই রয়েছে প্রতিক্রিয়া, কষ্ট, সংকট মোকাবেলার সাহস।

যারা সাহিত্যিক তারা মুক্তিযুদ্ধকালীন জীবনের যন্ত্রণার কথা বলেছেন। বলেছেন প্রেম, ভালোবাসার জীবন কিভাবে মৃত্যুনীল হয়ে উঠলো। আবার মৃত্যুনীল অবস্থার মধ্যেও প্রেম কিভাবে বিকশিত হলো সেকথাও বলেছেন তারা।[১৬]

গবেষকরা বিশ্লেষণ করে করে দেখাতে চেয়েছেন যুদ্ধের সহিংসতার শিকার নারী কিভাবে বৈষম্যমূলক মর্যাদা পায় একই সময়ের সহিংসতার শিকার পুরুষের তুলনায়। পুরুষ হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, নারী হয়েছে বীরাঙ্গনা। পুরুষ পেয়েছে মর্যাদা, নারী পেয়েছে অস্বীকৃতি। বীবপ্রতীক তারামন বিবিকে (১৯৭২ এ ঘোষিত) সাংবাদিক, গবেষকের সূত্রে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ১৯৯৫-এ। এরপর তাকে বীরপ্রতীক পদক তুলে দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। যুদ্ধ করেছেন বহু মহিলা। তাদের বীরপ্রতীক, বীর সম্মান দেওয়া হয়নি। অথচ লক্ষ-কোটি পুরুষ পেয়েছে বীরের সম্মান।

সরকারি-বেসরকারি-রাজনেতিক কোন উদ্যোগের মধ্যে নারীদের সংযুক্ত করা হয়নি। ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠকের কাজ যে নারীরা করেছেন তাদের নাম তালিকায় নেই। নারীদের একাকী দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ফেলে রেখে কোটি কোটি মুক্তিযোদ্ধা চলে গেলেন সীমান্তের ওপারে। স্বদেশে নারীরা কষ্ট করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন—সেসব মুক্তিযুদ্ধের কাজ বলে আজও স্বীকৃত নয়।

গবেষকরা ও আজকের নারী-মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠকেরা সোচ্চার হয়ে দাবি জানাচ্ছেন যে, যুদ্ধ সহিংসতার জন্য, ধর্ষণের জন্য পাকসেনাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মামলা করতে হবে।[১৭]

গবেষকদের দৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধা নারীদের পরিচিতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা উচ্চকিত হয়েছে জাতীয় পরিচিতির জন্য, বাঙালির দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ তার মধ্যে নারীর স্বাধীনতা কিভাবে বিবেচিত হয়েছে?

ঐতিহাসিকভাবে জাতিসত্তার পরিচয় স্বীকৃতি, নারী সত্তার স্বীকৃতি ও পরিচয় (National Identity ও gender Identity) পরস্পর যুক্ত। উভয় পরিচিতিই খুব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে। জাতীয় সংকটের সময় নারী কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জাতির দর্শন ও মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতি যখন সংকট মোকাবিলা করে নারী তখন দুর্ভোগের শিকার হয় বেশি। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীসমাজ এই রকমই সংকট মোকাবেলা করেছেন।[১৮]

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও যোদ্ধা নারীরা পারিবারিক সহায়ক পরিবেশ থেকে তাদের কাজ করার প্রেরণা পেয়েছেন। নির্ভরশীলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে সাধারণ সময়ে নারীসমাজ দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে নারী আত্মনির্ভর, সাহসী, যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ নারীকে একদিকে যেমন অসহায় করেছে তেমনি সাহসী করেছে, যোদ্ধা করেছে।

সূত্র

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, মুজিবনগর প্রকাশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮।
২. প্রাগুক্ত দলিলপত্র, ১৫ খণ্ড, ১৯৮৫, পৃ. ১৯৭-১৯৮।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩২৪।
৪. বেগম মুশতারী শফী, স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ১৫৫-১৬৪।
৫. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।
৬. বেগম মুশতারী শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৭. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
৮. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, সম্পাদিত, একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৭, পৃ. ৪১-৬৪।
৯. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
১০. ঐ, পৃ. ৬৯-৭০।
১১. আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি, বাংলাদেশ ১৯৭১, লন্ডন, এশিয়া পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১। পৃ. ৩৬।
১২. ঐ, পৃ. ৬৮, ১৭১।
১৩. আবুল মাল আবদুল মুহিত, স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬।
১৪. সুমনা ও মুন্নীসাহা, ধর্ষিতা বোনের শাড়ি, ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা, ঢাকা, সাপ্তাহিক কাগজ পত্রিকা, ১৯৯২, পৃ. ১১-১৭।
১৫. ঐ।
১৬. খালেদা সালাহউদ্দীন, একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৬৪।
১৭. মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতির পুনরুদ্ধার, ঢাকা, আইন ও সালিশকেন্দ্রের বুলেটিন, ১৯৯৬।
১৮. Ayesha Banu, Mere Pawns or growing Power? Construction of National Identity in gender Identity in Bangladesh. London, Sussex university. 1994.

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তিযোদ্ধার মা

কবি সুফিয়া কামাল মুক্তিযোদ্ধা ছেলেমেয়েদের মা, নিজেও মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময়গুলো কেটেছে মুক্তিযোদ্ধাদের চিন্তায়। তিনি জাতির বিবেক হিসেবে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজ বাসায় কাটিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘরে বসেই কাজ করেছেন। তাঁর মেয়ে সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামাল ভারতের সোনামুড়া হাসপাতালে কাজ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। কবি সুফিয়া কামালের আশ্রয়, সাহায্য, উদ্বেগ, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক পরম পাওয়া। তিনি সকল মুক্তিযোদ্ধার মা।[১]

'জাহানারা ইমামের বাসায় দেয়ালে রুমির সামরিক পোশাক পরা তৈল চিত্রটি দেখলাম। গেরিলা যোদ্ধা রুমি এ পোশাক পরতে পারেনি। এ তার মা জাহানারা ইমামের কল্পনা। ছবিটির নিচে লেখা 'আবার আসিবো ফিরে এই বাংলায়'—সরদার ফজলুল করিম-এর লেখা থেকে মুক্তিযোদ্ধার মায়ের এই চিত্রটি প্রতীকভাবে ধরলে বলা যায় সব ঘরে ঘরে মুক্তিযোদ্ধার মায়ের চিত্রকল্প এরকমই। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার প্রতিটি মা নিজেরাও ইতিহাসের অমোঘ পরিক্রমায় হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা। জাহানারা ইমাম তারই প্রতীক।[২]

মুক্তিযোদ্ধার মা-এর রূপ একই। তারা ত্যাগী, তারা সহনশীল, অসীম ধৈর্যে এবং মর্যাদায় তারা সন্তানদের যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। এরকম কয়েকজনের কথা লিপিবদ্ধ করছি :

- বেগম ফয়জুন্নেসার দুই ছেলে মাকে দাদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর নামে তোমাদের ছেড়ে দিলাম। বীর বেশে তোমরা ফিরে আসবে। আমার মাসুদ সেক্টর কমাণ্ডার হয়ে ফিরে আসলো। আমার দুঃখের রাত ফুরালো।[৩]
- নূরুন্নাহার বেগম-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা ছেলে লেফটেন্যান্ট আতিকুর রহমান সিরাজী। নিহত হন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাকবাহিনীর হাতে। তিনি কোনো অর্থ সাহায্য চাননি। চেয়েছেন সন্তানের আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতি। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আতিকের নামে নিজ গ্রামে একটি জুনিয়র হাইস্কুল করেছেন। জমি দান করেছেন স্কুলের জন্য।[৪]
- জয়গুরু বিশ্বাসের মা প্রমীলা বিশ্বাস। মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র ছেলে শহীদ হয়েছেন। মা পাগল প্রায় হয়ে স্তব্ধ।[৫]
- ঈশ্বরদীর প্রথম শহীদ আরম বাড়িয়া গ্রামের শেলি মোস্তফার মা শোকে পাথর হয়ে যান।[৬]
- মুক্তিযোদ্ধা এ এম জি কবির তার মায়ের কথা বলেছেন
  মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেব বলে মাকে বললাম, আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, আমি

অন্যায় কিছু করতে পারি না। মা আমাকে বাধা দিলেন না। স্টেনগানটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন 'বাবা তুমি কোরানের ওপর নির্ভর কর।' আমি যুদ্ধে গেলাম।[৭]

- বাংলাদেশের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিম চৌধুরী (জুয়েল)-এর মৃত্যুর পর তার মা বলেছেন
  যে ক্রিকেটকে ভালোবাসতো, সে স্টেনগান হাতে নিল, আমি মা হয়ে মানা করিনি। নিজের চোখে যখন দেখলাম অসংখ্য মানুষ মিলিটারীর হাতে প্রাণ দিচ্ছে তখন বাছাকে আমি মানা করি কিভাবে? আমি জানতাম স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন প্রাণকে উৎসর্গ করে তার পরিণতি কি হয়। তাই ছেলের মৃত্যুতে আমি অবাক হইনি।[৮]
- অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক বলেছেন তার শাশুড়ির কথা
  স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অবাঙালি নরপশুদের হাতে আমার স্ত্রী মারা যায়। আমি যখন কাঁদি তখন শাশুড়ি আমাকে প্রবোধ দিতেন। তিনি কোনো নাম করা মহিলা ছিলেন না। তিনি বলতেন; তুমিতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছো। দেশ স্বাধীন হবে আর আমাদের কোনো আত্মীয় মারা যাবে না এটা তুমি কেন ভাব?[৯]
- মুক্তিযোদ্ধা কালাম, সালাম-এর মা শহীদের মাকে সরকারের দেয়া ১০০ টাকা অর্থ সাহায্য ফেরত দেন। বলেন আমার বুকের সন্তান দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাদের কথা, শহীদের কথা কেউ যেন না ভুলে। আমি দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি দেশের যেন ভালো হয়।[১০]
- মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলাম লিখেছেন :
  গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে যখন ঢাকায় যাচ্ছি যুদ্ধ করতে তখন গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবার সময় মুক্তিবাহিনী এসেছে বলে সমস্ত গ্রামে খবর হয়ে গিয়েছে। সব বাড়ির মায়েরা বেরিয়ে এসেছেন নিজেদের সন্তানদের খোঁজ নিতে। খবরাখবর নিতে আমরা আগাতে থাকি। বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না। ভিতর থেকে মহিলারা আপত্তি তুললেন, নাস্তা না খেয়ে যেতে পারবে না। ভিতর থেকে কাঁঠাল, মুড়ি, খই, খাবার ব্যবস্থা হল।
- মায়েদের ভাবভঙ্গি এই যে, মা বাবা সন্তানদের আগলে রাখতে চাইবেই আর আমরা সন্তানরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো। আম্মার সঙ্গে দেখা হলে লুকিয়ে তিনি চোখের জল মুছলেন, আমার প্রিয় খাবারগুলো রান্না হয়েছে। আম্মার বায়না তার সামনে বসে খেতে হবে।[১১]

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে পাঠিয়ে বা যুদ্ধে লুকিয়ে চলে যাবার পর সন্তানদের মায়েরা কেঁদেছেন, কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন যে সন্তানরা যেন দেশ স্বাধীন করে। সন্তানের মৃত্যুর পরও আনন্দাশ্রু নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েরা স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে গান গেয়েছেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েরা এদেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা।

উইমেন ফর উইমেন এর গবেষক অধ্যাপক ড. নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা 'একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ'-এ সংকলিত করেছেন মুক্তিযোদ্ধার মায়েদের কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রকাশিত বহু বইয়ের মধ্যে এই বইটিতেই প্রথম বারের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সীমিত সাধ্যে লিপিবদ্ধ স্বল্প সংখ্যক সাক্ষাৎকারের বিবরণ এই বইয়ে থাকলেও উক্ত বইয়ের গবেষকদের কাছে জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে।[১২]

মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের কথা লিখেছেন কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম :

১. কাউলজানী বাজার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাদিয়াজানে ঘাটের সোজা পাঁচশত গজ পূর্বে কাউলজানীর চৌধুরী বাড়ি। ... এই বাড়ির বা পাড়ার পঁচিশ ত্রিশ জন তখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছে। আমি মাত্র মিনিট খানেক হলো বৈঠকখানায় বসেছি। এর মধ্যেই রঞ্জুর মা এলেন? এসেই রঞ্জুর খোঁজ-খবর নিলেন। একটু পরে এলেন ডা: শাহ্জাদা চৌধুরীর মা। তিনিও ছেলের খোঁজ খবর নিলেন। এরপর চৌধুরী বাড়ির সব চাইতে ধনী পরিবারের একজন মা, তার সঙ্গে দশ বছরের একটি ছেলে নিয়ে এলেন, নাম নজরুল ইসলাম চৌধুরী। মায়ের বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। তিনি এসেই তাঁর ছেলের হাত আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ওর বাবা ছয়-সাত মাস আগে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। আমাদের পয়সা কড়ির খুব একটা অভাব নেই। এই-ই আমার একমাত্র ছেলে, একে দেখাশোনা করার অভিভাবকের অভাব আছে। তুমি আমার বড় ছেলে, এর দায়িত্ব বাবা, তুমি নাও।'[১৩]

২. 'আমি আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লে বাড়ির মেয়ে ও মায়েরা সন্তান হারানোর মত আলু থালু অবস্থায় চিৎকার করতে থাকে। এই সময় মাথার কাছে নানা বয়সের দশ-বারো জন মহিলা দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ বাতাস করছিলেন। একজন পূর্ণ বয়স্কা মহিলা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রৌঢ়া মহিলা বললেন,—বাবা, এখন তোমার কেমন লাগছে? [১৪]

৩. আহত পুত্রকে ছেড়ে যেতে আমার মায়ের বুকের মাঝে মোচড় দিয়ে উঠলেও ধরা গলায় বললো, 'আল্লাহ, তোকে সফল করুন। তুই আবার শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠ্।[১৫]

৪. আমরা ঝাউয়াইল—ভেঙ্গুলা নদীর পাশ দিয়ে দক্ষিণে যাচ্ছি, আর হানাদাররা প্রায় আধমাইল দূরে দিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ... আমরা দৌড়ে ... শনের ঘরে আশ্রয় নিলাম। তখন বাড়ির মা বোনেরা রান্নাঘরে ছিলেন। আমাদের বাড়িতে উঠতে দেখে একজন মা-বোন ও কিছুমাত্র আপত্তি কিংবা অস্বস্তি বোধ করলেন না। ঘন্টাখানেক মুষলধারে বর্ষণের পর বৃষ্টির মধ্যেই আবার পথ চলার উদ্যোগ নিচ্ছিলাম। বাড়ির মা-বোনেরা বারবার বললেন, 'বাবারা, তোমরা এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় যাবে? এখানেই থেকে যাও।'

মুক্তিযোদ্ধাদের অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্টকে বাংলার মা-বোনেরা নিজেদেরই দুঃখ কষ্ট বলে মনে করেছেন।'[১৬]

মুক্তিযোদ্ধা বৈমানিক ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার লিখেছেন :

'এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমি এবং ক্যাপ্টেন রফি ঠিক করলাম, আমরা ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করব। ভাবলাম এই সময়টাতে মাদারীপুরের গোপালপুর গিয়ে মায়ের সঙ্গে এবং আমার বউ বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করে আসি। ... গোপালপুর পৌঁছে ... মায়ের সাথে দেখা করি। বাড়ি থেকে চলে আসার আগে শুধু মায়ের কাছে বললাম, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য আমি ভারতে চলে যাচ্ছি। মা কোনো আপত্তি করলেন না বরং আশীর্বাদ করলেন। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে মনে হয়, মায়ের সম্মতি এবং এই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।[১৭]

মুক্তিযোদ্ধাদের মা-এর কথা বলেছেন অঞ্জলি লাহিড়ী :[১৮]

'সেদিনকার বিত্তবান সমাজ সেবী হেমেন্ত দাশ পুরকায়স্থকেও গায়ে 'রিফিউজি' নামের লেবেল আঁটতে হলো। বৃদ্ধ স্ত্রীকেও জড়িয়ে ফেললেন মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতির মধ্যে। বৃদ্ধা তাই নিজের সন্তানদের পাশে ঠাঁই দিয়েছেন ঐ মুক্তিপাগল ছেলেগুলোকে। বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে দেই, সাদা চুল, দাঁত পড়ে গেছে। রেশনের পুষ্টিহীন খাদ্যে তাঁর দেহে

ভাঙ্গন ধরেছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বললেন, 'মা দেখেছ একবার ছেলেগুলোর দিকে? এদের বয়স কত জান?

ষোল থেকে পঁচিশ-তিরিশের মধ্যে। ওদের দেখি আর চোখের জলে বুক ভেসে যায়। কত মায়ের বুক খালি করে ওরা লড়তে নেমেছে। ছেলেরা ভালোবাসে তাই ভেতরে গেলে ডিমটিম ভালোমন্দ কিছু পেলে আমার জন্য নিয়ে আসে।

বলা নেই কওয়া নেই একসঙ্গে জনা তিরিশেক ছেলে এসে হাজির হয়, মাসিমা খেতে দিন, ভেতরে যেতে হবে। সরকারি কাঁকর ভরা চাল। তাই সবার কাছ থেকে ভিক্ষে করে একমুঠো একমুঠো ঘরে এনে রাখি, কখন কে এসে হাজির হয় ঠিক নেই তো। পেটের ছেলেরা লড়তে যাচ্ছে, এখন কি 'না' বলার সময়? নিজেরা খাও না খাও, যারা দেশের জন্য লড়তে যাচ্ছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।'

এটাই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার মায়েদের চিরন্তন চিত্র।

তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'মুক্তির কথা'র পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি মুক্তিযোদ্ধার মায়ের কথা বুঝার জন্য :[১৯]

> 'জনৈক মুক্তিযোদ্ধা মা বাপের পা ধইরা কানছি—আমাগোর এই কষ্ট সহ্য হয় না। না পাই খাওয়ার, না পাই পানি, না পাই বস্ত্র, না পাই আরাম, না পাই বিছানা—মা বাপে ঠেইলা বাড়িত থাইকা বাইর কইরা দিছে, না দুঃখ করগা, কিন্তু এইভাবে পাঞ্জাবীদের হাতে তোরা মরিস না, এইভাবে মা বাপে বাড়ি থাইক্যা বাইর কইরা দিছে, দেশের জন্য মইরা যা, তাও হাদীসে শুনি যে পরকালে শহীদ হবে। এইভাবে আমাদের ঠেইল্যা ধাক্কাইয়া বাড়িত থাইক্যা বাইর কাইরা দিছে। কাইন্তে কাইন্তে বন্দুক হাতে নিয়া বাড়াইয়া আইছি।'

৩০ লাখ শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা, ২ লাখ (আরও বেশি বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে) নির্যাতিত মেয়েদের মা, একই বেদনা, শোক ও শক্তিতে বলীয়ান। এঁরা স্নেহে, প্রেমে, যত্নে, সন্তানদের আগলে রাখতে চেয়েও পারেননি। ছেলেরা যুদ্ধে শহীদ হয়েছে পাকবাহিনীর নৃশংসতায় আর মেয়েরা নির্যাতিত হয়েছে পাকসেনাদের বর্বরতায়। স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা এরা সকলেই। এঁদের মায়েরা অন্তরে ধারণ করেছেন স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকুলতা, অসীম ব্যাকুলতা। সন্তান হারিয়েও তাদের সেই ব্যাকুল অপেক্ষা বিজয় দিবস পর্যন্ত তিল তিল করে সঞ্চিত ছিল। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা জাগিয়েছে চিরশান্তি। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তাদের লাখ লাখ সন্তান, ছেলে ও মেয়েদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা যেকোনো মূল্যে অক্ষুণ্ন থাকবেই। এঁদের দুঃখ শহীদ সন্তানের, নির্যাতিত মেয়েদের অবদান সকলে মনে রাখেননি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের কথা মনে রাখেননি। অভাবী-দরিদ্র মায়েরা অন্তরের অমূল্য সম্পদে এতোটাই সম্পদশালী ছিলেন যে, অধিকাংশ মা কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করেননি। অনেকেই সরকারের অর্থ সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছেন বিনয়ের সঙ্গে।

দেশের কোটি কোটি সন্তান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সকলের মা সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় চোখের পানি ফেলতেও দ্বিধা করেছেন। বাড়িতে বাড়িতে, গ্রামে গঞ্জে মায়েরা মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য নিজের দা-বটি নিয়ে প্রস্তুত থাকতেন মিলিটারী-রাজাকার মেরে তবে নিজেরা মরবেন, এই প্রতিজ্ঞায়। তারা সকলেই শুধু মাত্র মুক্তিযোদ্ধার মা নন, মুক্তিযোদ্ধাও নিঃসন্দেহে।

সূত্র

১. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, একাত্তরের প্রচ্ছদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
২. সরদার ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।
৩. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।
৪. একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-৪০।
৫. মুনতাসির মামুন, একাত্তরের বিজয় গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।
৬. ঐ, পৃ. ১১৮
৭. সরদার ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ; ১৪৯।
৮. ঐ, পৃ. ১৭৬।
৯. হারুণ হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।
১০. ঐ, পৃ. ১১০-১১৩।
১১. জহিরুল ইসলাম, একাত্তরের গেরিলা, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১১৭, ১১৮, ১২২।
১২. খালেদা সালাহউদ্দিন, জাহানারা হক, নীলুফার বেগম, হোসনে আরা জামান, চাঁপা দাশগুপ্ত, লতিফা আকন্দ, খাদিজা খাতুন, নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ, প্রাগুক্ত।
১৩. কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৭৯।
১৪. ঐ, পৃ. ৩৪৭।
১৫. ঐ, পৃ. ৩৫৫।
১৬. ঐ, পৃ. ৪৫৩।
১৭. রহীম শাহ সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধ পঁচিশ বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৭।
১৮. অঞ্জলি লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪ ও ২৮।
১৯. তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ, মুক্তির কথা, একাত্তর ব্রাত্যজনের কথা ইতিহাস, (প্রামাণ্য চিত্র) ঢাকা, ১৯৯৯।

অষ্টম অধ্যায়

যুদ্ধাহত

মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ, যুদ্ধ যখন চাপিয়ে দিলো পাকিস্তানের সামরিক জান্তা, গণহত্যা চালালো নির্বিচারে; তখন ঘরে ঘরে আগুন, নারীধর্ষণ, নারী নির্যাতন, যুবক, কিশোর, শিশু সন্তানদের হত্যা করা প্রতিদিনের পৈশাচিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ালো। বাংলাদেশের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা নতুন ছিল না। কিন্তু '৭১-এর ব্যাপক গণহত্যার মতো পাকসেনাদের গণধর্ষণ প্রমাণ করেছে জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ লঙ্ঘন করে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সেনাবাহিনী আসামি অবশ্যই। এ প্রসঙ্গে বেইজিং সম্মেলনে (১৯৯৫) গৃহীত দলিলের ১৩১ থেকে ১৪৯ ধারায় করণীয় পদক্ষেপের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, 'সশস্ত্র সংঘর্ষ বা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের মৌলিক নীতিমালার লঙ্ঘন। এ ধরনের লঙ্ঘনের সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ খুন, ধর্ষণ, সেই সাথে ধারাবাহিক ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব এবং গর্ভধারণে বাধ্য করা—এসব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। এসব কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিন্দিত করা, বন্ধ করা ও অপরাধী ও অপরাধের জন্য দায়ী মূল ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সকল প্রেক্ষাপটে বাঙালি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ধর্ষণ ও যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিনোদনের জন্য, সম্ভোগের জন্য নারীদের বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করার প্রসঙ্গটি এমন একটি দিক যা সমাজ, ব্যক্তি ও নারীর জন্য শুধুই 'লজ্জা' সৃষ্টি করেছে। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, নৃশংসতা, বাঙালি নিধন ও ধর্মের নামে অন্ধ নৃশংসতা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক, জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছে তীব্র মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ ও প্রেরণা। একজন মুক্তিযোদ্ধা বা নিহত পুরুষ সন্তানের জন্য উদার গৌরবময় পারিবারিক-সামাজিক পরিমণ্ডল ছিল এবং রয়েছে। কিন্তু ধর্ষিত নারীর জন্য পরিবার ও সমাজে নেই এবং ছিল না কোনো স্বাভাবিক উদার গ্রহণযোগ্যতা। ধিক্কার, লজ্জা, সম্ভ্রমহানি, মা বোনের ইজ্জতহানি এসব যুদ্ধাপরাধীর অপরাধকে লঘু করে দিয়েছে। নির্যাতিত নারী মানসিক আঘাতে জর্জরিত, একাকী অবহেলিত, ধিকৃত ও অপরাধ বোধে আত্মহত্যা করেছে অথবা পরিচয়হীন হয়ে হারিয়ে গেছে।

যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতনের, ধর্ষণের বিবরণ ও সাক্ষ্য রয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল-এর ১৫টি খণ্ডের দু'একটি খণ্ডে। যুদ্ধকালীন সময়ে যারা এই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা বা তাদের পরিবারের সদস্যরা খুব কমই এসব বিবরণ দলিলে লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে তথ্যে জানা যায় যে, ২ লাখ বাঙালি নারী ধর্ষিত হয়েছে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে পাকসেনাদের পরিকল্পিত নির্যাতনের ফলে। সর্বত্র এদের দোসর ছিল রাজাকার-আলবদর ঘাতক দালালরা। এদের পরিকল্পনার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে নিচের দু'টি উদ্ধৃত অংশে

১. মহিউদ্দিন আহমদ, এমপি, আওয়ামী লীগ ১৯৭১, সাক্ষাৎকার একাত্তরের পাকবাহিনীর বন্দী শিবিরে'—

'এক রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমার সেলের সামনে ৮/১০ জন প্রায় বিবস্ত্র মেয়েকে এনে রাখা হলো। পাশবিক নির্যাতনের ফলে তাদের সারা শরীর ছিল ক্ষতবিক্ষত। সমস্ত রাত ধরে তাদের কান্নাকাটি আমি শুনতে পেলাম। ৫/৬ বছরের বাচ্চাদের মাথা কেটে এনে তা ফেলে রাখা হলো আমার সেলের সামনে। পরদিন ভোরবেলা পাক কর্নেল বশির এসে বীভৎস কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলো 'উই' উইল মেক দিস কান্ট্রি আ ল্যান্ড অব প্রস্টিটিউটস, আ ল্যান্ড অব স্লেভস, আ ল্যান্ড অব বেগারস'।

২. '৭১-এ আলবদর নেতা মুহম্মদ আব্দুল বারির ডায়েরি (সূত্র একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়)

'তিতপল্লার শিমজুড়া গ্রামের জব্বারের কাছ থেকে ২৯/১০/৭১ (তারিখে) আর তিন হাজার নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।'

বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলাযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মী-নেতা, লেখক-সাহিত্যিক, ডোম প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ-অপরাধী পাক সেনাবাহিনীর দ্বারা নারী নির্যাতনের হৃদয় বিদারক তথ্য জানা যাচ্ছে। অধ্যাপক আবুল ফজল, কথা সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন, সেলিনা হোসেন, হারুণ হাবিব, মুসা সাদিক, মুশতারী শফী, মুনতাসির মামুন, টিপু খন্দকার, নাজিম উদ্দিন মানিক, হামিদুর রহমান, আসাদুজ্জামান আসাদ, ইমরুল কায়েস, জহিরুল ইসলাম, শাহিদা বেগম, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুলতানা কামাল প্রমুখ তাদের বই-এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন, সামাজিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যার প্রকট রূপ তুলে ধরেছেনে।[১]

তাদের দেয়া তথ্যগুলো বিশদ বিবরণমূলক। সেসব বিবরণ নারী নির্যাতনের পৈশাচিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। এখানে তা পুনরায় বর্ণনা করা নিরর্থক। আগ্রহী পাঠক সংশ্লিষ্ট বিবরণ পড়ে নেবেন উল্লেখিত বই থেকে। এখানে আমি উল্লেখ করছি সেই সব ভয়াবহ বহু ধরনের নির্যাতনের প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো :

- **স্বামীর সামনে স্ত্রীকে**
- **পিতার সামনে কন্যাকে**
- **শ্বশুরের সামনে ছেলের বউকে**

- পরিবারের সব মেয়েকে গণধর্ষণ ও হত্যা
- পাকসেনাদের বাংকারে ২০/৩০ জন করে বাঙালি তরুণী বালিকা নির্যাতন (অব্যাহতভাবে বন্দী করে রেখে)
- গ্রামে গ্রামে খান সেনারা তরুণ যুবক বয়সের ছেলেদের না পেয়ে কৃষাণী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, তরুণী, শিশুদের এককাতারে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করেছে।
- চোখের সামনে ছেলে বৌ, কিশোরী নাতনীকে পাক আর্মি ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ/প্রতিরোধ করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বৃদ্ধা, হয়েছেন অপ্রকৃতিস্থ।
- পরিবারের উঠতি বয়সী মেয়েদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শহরের লোক ছুটেছে গ্রামে আর গ্রামের লোক ছুটেছে শহরে।
- স্বামীকে হত্যা করে সদ্য বিধবাকে দিয়ে স্বামীর লাশ কবর দেওয়ানো হতো এবং মাকে দিয়ে নিহত পুত্রের লাশ কবর দেওয়াতো পাকসেনারা।
- সন্তান সম্ভবা, অন্তঃসত্তা ও সদ্য প্রসবা জননীকে নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন করে শিশুকে ও মাকে হত্যা করা হয়েছে।
- নখের ভেতরে সূঁচ, বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন পেট, বুটের নিচে মাথা। ডজন ডজন সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিশোরী-তরুণীদের ওপর। শুধু ধর্ষণেই মারা গেছে অনেকে, অন্যদের মারা হয়েছে সোল্লাসে।
- বল্লমের মাথায় শিশুর লাশ গেঁথে উল্লাস করেছে পাক সৈন্যরা, মায়ের কোল থেকে কেড়ে আছাড় দিয়ে মেরেছে শিশুকে, মায়ের কোলের শিশু কেড়ে নিয়ে তার মাথায় গর্ত করে পোঁতা হয়েছে পাকিস্তানের পতাকা।
- রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, দেশের বিভিন্ন বাঙ্কারে, ক্যান্টনমেন্টে আটক করে রাখা মেয়েদের চুল দিয়ে বেঁধে লটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে। কুপিয়ে আনা হয়েছে শরীরের বিভিন্ন অংশ।

পাকসেনারা নিজেদের উন্মত্ত বিকৃতিকে বারবার চরিতার্থ করতে গিয়ে অনেক তরুণীকে নিজেদের বাঙ্কারে নিয়ে গেছে। এরা অন্তঃসত্তা হলে বা রোগাক্রান্ত হলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বা খুন করেছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয়েছে দুই লাখ নারী। সুসান ব্রাউন মিলার রচিত Men, Women and Rape বইয়ে তথ্য রয়েছে : 'হিসাব অনুযায়ী ২,০০,০০০ (দুই লাখ) বাঙালি নারী নয়মাসব্যাপী সংঘর্ষে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল।[২]

যুদ্ধের ঠিক পরপর বাংলাদেশে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শল্য চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিস। লন্ডনে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, '৯ মাসে যে নারীরা ধর্ষিত হয়েছেন পাকবাহিনী দ্বারা, তাদের অনেকেরই সম্ভাবনা আছে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার, অনেকে ভুগতে পারেন বারবার জীবনভর। তিনি বলেছিলেন ১ লাখ ৭০ হাজার গর্ভপাত করেছেন তিনি। ২ লাখ ধর্ষিতার অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ নিজেই লালন করেছেন সন্তানকে।[৩]

নারী নির্যাতনের বিবরণ পাওয়া যায় স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলের ৮ম খণ্ডে। জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাকবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কয়েক জনের চিঠিতে উল্লেখিত রয়েছে নারী নির্যাতনের বর্বর ঘটনার কথা :

১. At Gazaria the said Pak troops most inhumanly killed in all 8 hundred men, Women and children by Machine Gun fire and looted all the cash, gold ornaments and other valuable found in their houses. In broad day light the said Pak troops took into Custody women and girls of the ages running from 12 to 30, folded bind them, took them to the Military cantonment & ultimately despatched them to west Pakistan.

১০.৬.৭১ (৮ম খণ্ড, পৃ. ৩) চৌধুরী এবিএম কায়সার আহমেদ
দাউদকান্দি, কুমিল্লা (আগরতলা থেকে প্রেরিত)

২. In the last week of may last I saw two teen aged girls of Barura P.S. having been carried in an Army jeep via halmai towards Comilla. Near village Dharmapur they raped one of those two girls on the Public road.

11.6.71 A.F.M. Fajlul Huque, Agartala. (৮ম খণ্ড, পৃ. ৪)

৩. In June last the Pak troops Came in Jeeps raided Demra area set fire to the houses, killed people by gun fire and took away Women and girls of bolh Communities'

Dipali Rani Sarkar, Agartala, 24-7-71 (৮ম খণ্ড, পৃ. ১০)

জেনেভায় মানবাধিকার কমিশনে পাঠানো এই সব চিঠি বা অভিযোগ বা প্রতিবেদনের ফলাফল আমরা জানি না। তবে এই দলিলে সংকলিত ১০টি প্রামাণ্য আবেদন পত্রের লেখকদের বিবেক তাড়িত মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে যুদ্ধকালীন সময়ে চোখের সামনে নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার হতে দেখেও এবং ওদের বাঁচাবার আর্তনাদ শুনেও অসহায়ভাবে পালিয়ে আসার জন্য অনুশোচনা।

একইভাবে অনুশোচনা করেছেন নারী নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী ৬ জন পুলিশ কর্মকর্তা তাদের দেয়া সাক্ষাতকারে। তারা সকলেই গভীর মর্মবেদনার সাথে বলেছেন রাজারবাগ ও রমনা থানার দখলে থাকা পাক আর্মির সেনারা, পুলিশরা নারী ধর্ষণ করেছে পৈশাচিক উন্মত্ততায়। ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদে তাদের দুর্দশা দেখে দুঃখে ক্ষোভে বেদনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়লেও কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। ওদের উদ্ধার করার মতো কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। এই অনুশোচনা তাদের পীড়িত করেছে সেই সময়। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গণহত্যা, আগুন দিয়ে, নির্যাতন করে নারী, শিশু, যুবক হত্যার বিবরণ দিয়েছে ৬ জন ডোম।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপার মিসেস রাবেয়া খাতুন ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজারবাগ পুলিশ স্টেশনে নারীর ওপর পাক সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের সাক্ষী হিসেবে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ১৯৭৪-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি। তিনি নিজেও ধর্ষিতা হয়েছেন পাকসেনাদের দ্বারা। সুইপারের কাজ করার কাতর অনুনয় জানিয়ে ছাড়া পেয়েছিলেন রাবেয়া খাতুন। তিনিও অনুশোচনায় বিবেকের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে বলেছেন 'মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারিতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঙালি মেয়েদের বাঁচাবার জন্য কোনো ভূমিকা পালন করতে পারি নাই।' (পৃ. ৫৩) এই দলিলে (৮ম খণ্ড) নারী নির্যাতন বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন থেকে নেয়া সাক্ষাতকার লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে নির্যাতিত নারীদের সাক্ষাৎকার এবং তাদের সম্পর্কে বিবরণ। শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' বইয়ে গণহত্যা, নির্যাতন ও বর্বরতার বিশদ বিবরণ রয়েছে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'দৈনিক বাংলার বাণী'র গণহত্যা বিশেষ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন শাহরিয়ার কবির। 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' বইয়ের ভূমিকায় শাহরিয়ার কবির নির্যাতিত নারীদের প্রসঙ্গে লিখেছেন। একাত্তরের নির্যাতিত ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয় ভাষিণীর সাক্ষাৎকার তার বইয়ে প্রথম বারের মতো প্রকাশ করে শাহরিয়ার কবির আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এখানে সে সব প্রতিবেদন থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

'দখলদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতন কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী, ইটালির ফ্যাসিস্ট বাহিনী কিংবা জাপানী সৈন্যদের নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বহু ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু একাত্তরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। আড়াই লাখেরও বেশি নারী এই সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু নারী আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানিরাও তাদের ধর্ষকামী প্রবৃত্তির কারণে বহু নারীকে ভয়ঙ্কর সব নির্যাতনের পর হত্যা করেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গণহত্যার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও নারী নির্যাতনের বিবরণ সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ সমাজে একজন ধর্ষিতা নারী এ বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে চান না সংস্কার এবং সামাজিক ও পরিবারিক বৈরিতার কারণে। সেই সময়ে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত সমাজকর্মী মালেকা খান বলেছেন, তখন কোনও তালিকা তৈরি করা হয়নি, কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন এই সব নারীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত না করে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ঢাকায় মালেকা খান পাঁচ হাজারের বেশি নির্যাতিতা নারীর জবানবন্দি নিজে পাঠ করেছেন। এসব কাগজপত্র বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর ধ্বংস করে ফেলা হয়। মালেকা খান আমাদের আরও জানিয়েছেন প্রথম পর্যায়ে যাদের গর্ভপাত করানো সম্ভব ছিল তাদের গর্ভপাত করানো হয়েছে।[৪]

বাংলার বাণী'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় :

ডা: ডেভিস বলেন, 'চট্টগ্রামে আমি একজন মহিলাকে দেখেছি, তিনি বিধবা। যুদ্ধে তাঁর ঘর বাড়িধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর সন্তান দু'টি এবং তিনি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভপাত ঘটানোর পর এই মহিলার থাকার মত স্থান নেই। ছেলে মেয়েদের আহার যোগানোর কোন সংস্থান নেই।

আরেকজন মহিলার স্বামী যখন যুদ্ধে গেছেন তখন তাকে হানাদাররা ধর্ষণ করে। স্বামী এসে স্ত্রীকে দেখেন গর্ভবতী। তিনি স্ত্রী এবং দু'টি সন্তানকে ফেলে চলে যান। এবং বলে যান যে, আর তিনি তাদের গ্রহণ করবেন না।

আরেকজন তরুণী বয়স ১৯। অশিক্ষিতা। সে ছিল ছয় মাসের গর্ভবতী। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে স্বল্প কালের জন্য সাহায্য কেন্দ্রে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর সে কোথায় যাবে কেউ জানে না।'[৫]

শাহরিয়ার কবির বলেছেন

'বাহাত্তরে যে সব যুদ্ধ শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের সম্পর্কেও তথ্য খুব কমই রয়েছে। অধিকাংশ শিশুকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পরিবার দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম। নির্যাতিত নারীদের কয়েকজনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে যাঁদের উল্লেখ রয়েছে তাঁরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, যাঁদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আটক রাখা হয়েছিল বাঙ্কারে বা বন্দী শিবিরে। এঁদের একজন লিখেছেন—

'আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন মেয়ে গলার শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা যাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।

পরদিন হঠাৎ একটি মেয়ে মারা যায়। অন্তসত্ত্বা ছিল। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ওরা বন্ধ দরজায় অনেক চেঁচামেচি করল। কেউ এল না। মেয়েটার নাম ছিল ময়না। বছর পনের বয়স হবে। কাটা পাঁঠার মতো হাত পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল, মুখখানা নীল হয়ে গেল। বয়স্কা সুফিয়ার মা একটা ছোট কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল কারণ, ঘরে ওরা চাদর দেয় না। সন্ধ্যার পর ওরা লাশটা নিয়ে গেল। এ ধরনের বিবরণ রয়েছে নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রন্থের সর্বত্র।'[৬]

'বীরাঙ্গনাদের তালিকা সম্পর্কে অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু এই তালিকা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সমাজ এঁদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মতো উদার নয়। বঙ্গবন্ধু আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন একাত্তরের নির্যাতিতা নারীরা যেন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।'

নীলিমা ইব্রাহিম আরও বলেছেন যে, ১৯৭২ সালে যখন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা ভারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি খবর পান যে, প্রায় তিরিশ চল্লিশজন ধর্ষিতা নারী তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এঁদের সঙ্গে দেখা করেন এবং বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু আপনজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁরা দেশ ত্যাগে অনড় ছিলেন। এঁদের ভেতর চোদ্দ-পনের বছরের এক কিশোরীও ছিল। নীলিমা ইব্রাহিম এই কিশোরীকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, আমার মেয়ের মতো।' তবু সে রাজী হয়নি। বলেছে, 'আপনি যখন থাকবেন না তখন কী হবে? যখন লোকে জানবে পাকিস্তানিরা আমাকে স্পর্শ করেছে তখন সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।' নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন, 'তুমি কী জান পাকিস্তানিরা তোমাকে নিয়ে কী করবে?' মেয়েটি জবাব দিয়েছে, 'জানি, ওরা আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না।'[৭]

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে '৯২-এর ২৬ মার্চ যখন গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয়—কুষ্টিয়া থেকে তিনজন বীরাঙ্গনা ঢাকা এসেছিলেন সাক্ষ্য দিতে। তখন বিভিন্ন দৈনিকে তাঁদের কথা লেখা হয়। এঁরা তিনজন গ্রামে ফিরে নিজেদের আবিষ্কার করেন একরকম একঘরে অবস্থায়। লোকজন তাদের বিভিন্নভাবে বিদ্রুপ করেছে। তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে আরেক বিড়ম্বনা। একাত্তরের নির্মম ক্ষত আবার তাঁদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণের কারণ হয়েছে। তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকবেন এ রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। তাঁদের একজন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, বিচারের আশায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন।। আজ অবধি তাঁরা বিচার পাননি অথচ প্রতিনিয়ত গঞ্জনার শিকার হচ্ছেন।[৮]

একাত্তরে আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, পাশাপাশি দেখেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহত্ত্ব। পাকিস্তানি বন্দি শিবির থেকে বেরিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের গোলাগুলির আঘাতে আহত কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন হাসপাতালে করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে যে সব যুদ্ধাহতরা ছিলেন তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মানবিক আচরণের একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রন্থ থেকে। বাঙ্কারে বন্দি নির্যাতিতা নারীরা ১৬ ডিসেম্বর যখন প্রথম 'জয় বাংলা' শ্লোগান শুনলেন তখন তাঁরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন দেশ হানাদার মুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তখন বেরুবার উপায় নেই। কারণ তাঁদের পরিধানে কোনও বস্ত্র ছিল না। নীলিমা ইব্রাহিম নির্যাতিতা শেফার জবানিতে লিখেছেন—

> 'হঠাৎ অনেক লোকের আনাগোনা, চেঁচামেচি কানে এল। একজন বাঙ্কারের মুখে উঁকি দিয়ে চিৎকার করল, কোই হ্যায়; ইধার আও। মনে হল আমরা এক সঙ্গে কেঁদে উঠলাম। ঐ ভাষাটা আমাদের নতুন করে আতঙ্কগ্রস্ত করল। এরপর কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠ,

এবারে মা আপনারা বাইরে আসুন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আপনাদের নিতে এসেছি। চিরকালের সাহসী আমি উঠলাম। কিন্তু এত লোকের সামনে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দৌড়ে আবার বাঙ্কারে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কন্তু যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্রথম আওয়াজ দিয়েছিল, 'কোই হ্যায়,' সেই বিশাল পুরুষ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটা খুলে আমাকে যতটুকু সম্ভব আবৃত করলেন। ভেতরে আরও ছয়জন আছে বলায় আশপাশ থেকে কিছু লুঙ্গি, শার্ট জোগাড় করে ওরা একে একে বেরিয়ে এল এবং ওদের কোন রকমে ঢাকা হল। আমি ওই শিখ অধিনায়ককে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠলাম। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'রো মাৎ মায়ি।'

এরপর শেফা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। বিয়ের পর তাঁর প্রথম সন্তানের নাম শ্বশুর রেখেছিলেন আরমান। কিন্তু শেফা ওকে ডাকেন 'যোগী' বলে।

'কেউ জানে না এ নামের পরিচয়। শুধু শেফা এ নামটা তার হৃদয়ে রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছে। শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে শেফা সেদিন একজন দেবদূত প্রত্যক্ষ করেছিল, তার নাম যোগন্দির সিং, যে তার পবিত্র শিরস্ত্রাণ খুলে শেফার অপিবিত্র দেহটাকে ঢেকে দিয়েছিল আর কয়েকবার তাকে মাতৃ সম্বোধন করেছিল। তাই শেফা মনে মনে যোগীন্দরকে তার প্রথম সন্তান ভাবে। আরমানকে যোগী ডেকে তাকে চুমুতে ভরিয়ে দেয়। মনে মনে বলে, আল্লাহ, যেন তেমনই সারা জীবন মায়ের সম্মানের হেফাজত করে।[৯]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, যিনি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস খুলনায় ক্রিসেন্ট জুট মিলে কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে কার্যতঃ বন্দি ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন হানাদার বাহিনীর বর্বর নির্যাতন। গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন;[১০]

'আম ফেরদৌসী বেগম। ছোটবেলায় আমার মাতামহ আব্দুল হাকিম, যিনি এক সময় পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন, আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন প্রিয়ভাষিণী। আমি একাত্তরের আড়াই লক্ষ ধর্ষিতা নারীর একজন।

আজ আটাশ বছর পর আমার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা আপনাদের বলছি এ জন্য যে, একাত্তরে যারা এদেশে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, আড়াই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছে, আজও তাদের বিচার হয়নি। আজকের প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে একাত্তরে কী ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মুখোমুখি আমাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছে। আজ সেই দুঃসময়ের কথা এ কারণেও বলতে চাই—অন্য সব নির্যাতনের কথা বিস্তারিত বলা হলেও নারী নির্যাতনের কথা আমরা খুবই কমই জানি। এর প্রধান কারণ সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল বৈরি পরিবেশ। আমি আশা করব আমার এই জবানবন্দি অন্য সব নির্যাতিত নারীদের সোচ্চার হতে সাহায্য করবে।'

তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'মুক্তির কথা' অজানা তথ্য দিয়েছে। কোদালিয়া গ্রামে গণহত্যার শহীদ ১৮ জন নারী ও তাদের শিশুদের গণকবর আজও সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পায়নি। কোন স্মৃতিফলক নেই সেই গণকবরে, নেই কোন যত্নের উদ্যোগ। বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীরা আজও তাদের দেহে ও মনে গভীর ক্ষত নিয়ে দিন যাপন করছেন।

সুফিয়া বলেছেন : 'আমার মাইয়ার নাম হামিদা। আট মাসের গর্ভবতী ছিল। ওর গুলি লাগছিল। ... আব্বা আমারে একটু পানি খাওয়ান।—এ্যাতা আচায় কইরা, ইডু পানি নিয়া খাওয়াইছিল। পানি খাওয়ার সাথে সাথে দম বাইরাইয়া গেছে।'[১১]

'মুক্তিযুদ্ধে কসবা' বইয়ে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে একাত্তরের নারী নির্যাতন ক্যাম্প ও অন্যান্য বিষয়ে। এখানে তা উদ্ধৃত করছি :[১২]

১. 'নারী নির্যাতন ক্যাম্প আমাদের ইউনিয়নে (কসবার গোপীনাথপুর ইউনিয়নে) দুইটা ছিল। একটা হলো চণ্ডীদ্বার হাইস্কুলে আর একটা হলো ইমামবাড়ি স্টেশনে। (পৃ. ২৯)

২. প্রত্যেক ক্যাম্পে যেমন তেমনি কসবাতে (কসবা স্টেশন রোড গ্রামে) টি আলীর বাড়িতেও যে ক্যাম্প ছিল সেখানেও নির্যাতিত নারী ছিল। অনেক আত্মগোপন করে যুদ্ধ শেষে চলে যায়। অসহায়দের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাম্পে, বাঙ্কারে, বিভিন্ন এলাকায় যাদের পাওয়া গেছে তাদেরকে ঢাকায় নিয়ে গেছে এবং বীরাঙ্গনা হিসেবে সাহায্য সহানুভূতি করা হযছে। অনেককে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরি দেওয়া হয়েছে। কসবা নারী নির্যাতনের যে ঘটনা এটার মূল নায়ক ছিল আড়াইবাড়ির রাজাকার কমান্ডার সিদ্দিক মিয়া। ১৬ই ডিসেম্বরের পর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। নারী নির্যাতনের আর যে ঘটনাগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কারভাবে কেউ প্রকাশ করে নাই। এখন সবাই নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেছে। নারী নির্যাতন প্রচুর হয়েছে। আমরা যা যা দেখেছি বা যা যা শুনেছি বা আমরা যা পেয়েছি এগুলো আমাদের কাছে রেকর্ডভুক্ত কিছু নাই। (পৃ. ৯৬)

৩. আমাদের এলাকায় (গ্রাম মঈনপুর) পাকবাহিনী যখন আসে তখন তাদের সাথে রাজাকার ছিল। আমরা ভয়েতে তাদের সামনে দাঁড়াইছিনা। আমাদের গ্রামে ঢুইকাই প্রথম সরকার বাড়িতে আগুন ধরায়। তারপর বাড়ির মেয়েদের ওপর নির্যাতন করছে। আমি নিজ চোখে দেখলাম। তারা যুগি বাড়িতে আগুন দিছে। স্বর্ণ অলংকার যা পাইছে তারা ছিড়া সব কিছু লইয়া গেছে মেয়েদের কান থেকে। (পৃ. ১০৭)

৪. আমাদের এলাকায় (লতুয়ামুড়া গ্রাম) পাকবাহিনীর নারী নির্যাতনের খবর পরবর্তীতে জানতে পারছি। লতুয়ামুড়া গ্রামের হাজি আব্দুল জব্বারের এক মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছিল। নাম নূরজাহান। (পৃ. ১১১)

৫. ফাইটিংটা হলো নয়নপুর গাজির বাড়ি পর্যন্ত (গ্রাম মন্দভাগ)। বাঙ্কার থেইকা মাইয়াডিরে বাইর করছি। একটা মেয়ের ওপর গুলি লাগছে আর দুইডা মেয়ে ভালো। শিক্ষিত মেয়ে। আরও মেয়ে পাইলাম চাইরড্যা। পাঞ্জাবী পাইলাম মরা। রাজাকার পাইলাম একজন জেতা। মেয়েরা বলছে যে আমরারে ধইরা আনছে। আইন্না এহেন অত্যাচার করছে, নির্যাতন করছে। পরে কোনাবন,

আগরতলা হাসপাতালে পাডাইছি। তারারে লইয়া যাওয়ার প্রায় একমাস পরে দেশ স্বাধীন অইছে। (পৃ. ১১৩-১১৪)

৬. (গ্রাম কুঠি) কালামুড়া নারী নির্যাতন হইছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে হইছে। আমার এলাকায়ও ছিল। কারো কারো ঘরের বউও ছিল। হয়তো ঘরে পুরুষ মানুষ ছিল না। ভয়ে তারা চইলা গেছে। ... আসলে এইগুলা আলাপ না করাটাই ভাল। কারণ, তাদের নাম বললে অসুবিধা হবে। (পৃ. ১৩০)

৭. (গ্রাম কালতা) মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবিদের দিত তবদিল হোসেন, মন্দভাগ বাড়ি। (পৃ. ১৭৩)

নারী নির্যাতনের তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে, সরকারি ও বেসরকারি দুই কেন্দ্রেই। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েই পাকসেনা ও রাজাকারদের দ্বারা নারী নিগ্রহ ও নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। যুদ্ধ শেষে জানা গেল বন্দি শিবিরে বাঙ্কারে আটকা পড়েছে লাখ লাখ নির্যাতিত মেয়ে। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বরের পর ৭ দিনের মধ্যেই গড়ে ওঠা নারী পুনর্বাসন সংস্থার দায়িত্বে ও বাংলাদেশ সরকারের নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের দায়িত্বে আশ্রয় প্রাপ্ত নির্যাতিত ২ লাখ নারীর জবানবন্দিতে তৈরি করা নির্যাতনের কেস হিস্ট্রীগুলো এক সময় পুড়িয়ে ফেলা হয় নির্যাতিত, আশ্রিত, চিকিৎসাপ্রাপ্ত মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। এই জ্বলন্ত রক্তাক্ত দলিলগুলো থাকলে এর সাহায্যেই আন্তর্জাতিক আদালতে নারী নির্যাতনের জন্য যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হতো সহজেই।

এখনো সম্ভব উদ্যোক্তাদের সাহায্যে এই ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা। এখনো সম্ভব নারী ধর্ষণের অপরাধে যুদ্ধঅপরাধীদের বিচার করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ধর্ষিত' জাপানের সামরিক পতিতালয়ের কোরিয়ান ও ফিলিপিনো নারীরা দীর্ঘ ৫০ বছর পর জাপান সরকারের ক্ষমা ভিক্ষার দাবি জানিয়েছে।

যুদ্ধের সময় ধর্ষণকে যুদ্ধ অপরাধ হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ কেন সেই দাবি জানাবে না? বাংলাদেশের নারী আন্দোলন '৯০ এর দশক থেকে এই দাবিতে অব্যাহতভাবে সোচ্চার রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারীদের বীরাঙ্গনা বলে রাষ্ট্রীয় সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু সমাজের দীর্ঘ লালিত সংস্কার ও মূল্যবোধ এই সমর্থনের পরও বদল হয়নি।

নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহিম রচিত আমি বীরাঙ্গনা বলছি 'এই সাক্ষ্যই' দিচ্ছে।[১৩]

সূত্র

১. গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ।

২. Susan Brown miller, Against our will : Men, Women and Rape; London, Penguin Books ltd. 1975. P. 79. রেফারেন্স মেঘনাগুহ ঠাকুরতার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : স্মৃতির পুনরুত্থান, সমাজ নিরীক্ষণ-৬১, আগস্ট ৯৬।

৩. সুমনা শারমীন ও মুন্নী সাহা, ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা, সাপ্তাহিক কাগজ পত্রিকা, মে, ১৯৯২ পৃ. ১২ এবং শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪।

৪. শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, একাত্তরের ঘাতকদালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩।

৫. ঐ, পৃ. ১৫।

৬. ঐ, পৃ. ১৫।

৭. নীলিমা ইব্রাহিম, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, ঐ, পৃ. ১৬-১৭, ১৯৯৫।

৮. ঐ, পৃ. ১৬।

৯. ঐ, প্রাগুক্ত।

১০. শাহ্রিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১১. তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ, প্রাগুক্ত।

১২. মঈদুল হাসান, সুকুমার বিশ্বাস, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধে কসবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, ৯৬, ১০৭, ১১১, ১১৩-১১৪, ১৩০, ১৭৩।

১৩. নীলিমা ইব্রাহিম, প্রাগুক্ত।

নবম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী

'একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠল রক্তের ছোপ লাগানো সাদা শাড়ি পরিহিতা একজন প্রৌঢ় মহিলার ছবি। তিনি সুফিয়া কামাল। কানে ভেসে এল তার বাণী—'আজ বাংলাদেশ স্বাধীন। আজ আমরা গৌরবময় স্বাধীন বাংলার নাগরিক।' তাঁর শাড়ি রক্ত রঞ্জিত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সময় যখন সারেন্ডার চলছে পাক সেনাদের সে সময় গুলিবিদ্ধ এক তরুণীর রক্তে। কবি টেলিভিশন অফিসে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ তরুণীকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। পাকসেনাদের শেষ সময়ের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিল নারী।[১]

১৬ ডিসেম্বর মুক্তির আনন্দে চারদিকে সকলে মেতে উঠেছিল। বেগম ফজিলাতুন্নেসা দীর্ঘ নয় মাস বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমেই এলেন কবি সুফিয়া কামালের বাসায়। দুজনের চোখে অশ্রু। দেশ স্বাধীন হলো। কবি হারিয়েছেন মেয়ের জামাইকে। মেয়ে দুলু বিধবা হয়েছেন। বেগম ফজিলাতুন্নেসা তখনও জানেন না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানীর বন্দীশালা থেকে কবে মুক্তি পাবেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও বিজয়ের সময়েও এই একই দৃশ্য নারীর জীবনকে ঘিরে আবর্তিত ছিল।[২]

স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মৃতিচারণে বলেছেন 'একদিন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আমাদেরকে বললেন ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। পাক-আর্মি আত্মসমর্পণ করবে। ওই দিন বিকেলে ভাঙ্গা শহীদ মিনারের পাদদেশে এক বিশাল গণ জমায়েত হবে। অনেক পোস্টার লিখতে হবে। আজমীরী, আমরা অনেকে, পোস্টার লিখলাম, জয় বাংলার জয়, আজ স্বাধীনতা, জয় বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি। বিকেলে বিশাল জন জমায়েত হলো। শ্রদ্ধেয় সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে ভাষণের কথা ভুলবো না। ৩২ নং রোডে আমাদের বন্ধু বাবর চৌধুরীর এক ডাক্তার বোন ডোরা স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর গাড়ি আর পতাকা নিয়ে সকালে রাস্তায় বের হলে পাক সেনার গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাকে গোরস্তানে শুইয়ে এসে সভায় তিনি বলেন, মাটির দাগ এখনো শুকোয়নি। এখনি এক বোনকে গোরস্তানে শুইয়ে দিয়ে এলাম। স্বাধীনতার মূল্য আর কত দিতে হবে? এই বলে, হু হু করে কেঁদে ওঠেন তিনি। তার সঙ্গে আমরা সবাই।[২]

সভায় এসেছিলেন শোকাকুল মা, শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্ত্রী, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রী, ভাই, বোন, মা, বাবা।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ঠিক দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর পাকজান্তা ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদররা হত্যা করেছে বুদ্ধিজীবী সেরা বাঙালিদের। শহীদ অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিকদের শ্রদ্ধা জানাতে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পাতি হচ্ছে দেশে। এই দিনে নিহত হয়েছিলেন সাংবাদিক সেলিনা পারভিন। তাঁর আত্মীয় স্বজন, শিশু সন্তান সুমন (এখন ব্যাংকে চাকরি করে) এসেছিল সেদিন শহীদ মিনারে।

সে সভাতে সবাই মিলে শপথ নিয়েছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন। তখন মাত্র মুক্ত স্বদেশে ফিরছিলেন সবাই। প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলন মেলা ছিল অভূতপূর্ব। এর মধ্যেও চলেছিল সংগঠিত প্রয়াস। নারী সমাজ আশান্বিত হয়েছিল। নতুন প্রেক্ষাপটে পাবে স্বাধীনতা। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে নারী সমাজের মুক্তির ঘোষণা, সম অধিকারের ঘোষণা, স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৩]

সূত্র

১. বেগম সুফিয়া কামাল, দিনটি কেটেছে বেদনায়, কষ্টে, সংকলিত প্রবন্ধ সম্মুখ সমরে বাঙ্গালী, রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩০।

২. হারুন হাবিব সম্পাদিত, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান ৫ বাংলাবাজার, পৃঃ ২০৮

৩. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০।

পরিশিষ্ট

বইয়ের এবং লেখার তালিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রে
নারীর অবদান বিষয়ে যে সমস্ত লেখা আছে তার সূচি

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
১	১৯৪৩	ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের আলোচনা সভার বিবরণ ১৯৪৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটাই বাংলার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রথম দাবি। এতে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।	বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ।	১ম	১২
২	২৫-২৬ জুলাই	নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা : দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বার্মায় নির্বাসিত হলেন। তার সঙ্গে প্রাণ দিলেন ঝাঁসির রাণী, অযোধ্যার বেগম।	সম্মেলন কমিটির পুস্তিকা	১ম	৭৬০
৩	ফেব্রুয়ারি ১৯৫০	নাচোল অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী ইলামিত্রের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত বক্তব্য।	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বদরুদ্দীন উমর।	১ম	১৫০-১৯৫১
8.	ঐ	সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যৌথ বিবৃতি। এতে সম্পাদক হিসেবে আছেন আনোয়ারা খাতুন ও ঊষা রায় (আনন্দবাজার)	ঐ	১ম	১৫২-১৫৪
৫.	২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২	বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সুপারিশ : এতে মিসেস আনোয়ারা খাতুন একটি সংশোধনী পেশ করেন।		১ম	৬৮২
৬	২৩ এপ্রিল ১৯৫৪	পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন : এর সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে সহসভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, সদস্য ছিলেন দৌলতননেসা খাতুন ও লায়লা সামাদ।	সাহিত্য সম্মেলন প্রচার কমিটি	১ম	৩৯৬-৩৯৭
৭	১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯	বর্ণমালা সংস্কারের প্রতিবাদে ৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস লায়লা সামাদ, নূর জাহান বেগম।	দৈনিক পাকিস্তান	২য়	৩৭১

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
৮.	১ ডিসেম্বর ১৯৭০	শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী প্রচারপত্রে শহীদ আনোয়ারার অবেদনের কথা উল্লেখ করেন।	আওয়ামী লীগ প্রচারপত্র	২য়	৫৮৩
৯.	১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩	সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবসের কর্মসূচিতে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দা শমসের আরা, রওশন আক্তার বানু, মতিয়া চৌধুরী, জাহানারা বেগম, তাহমিদা খানম, মাজেদা খাতুন।	ছাত্রসমাজের প্রচারপত্র	২য়	২০৯
১০.	২৫ জুন ১৯৬৭	রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের বিরোধিতা করে ১৮ জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন। তাদের মধ্যে স্বাক্ষরকারী হিসেবে ছিলেন সুফিয়া কামাল ও ড. নীলিমা ইব্রাহিম।	বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।	২য়	৪২৭
১১.	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	পল্টনের জনসমুদ্রে গৃহীত ছাত্রসমাজের প্রস্তাবাবলীতে উল্লেখ করা হয় মতিয়া চৌধুরীকে মুক্তি দিতে হবে।	দৈনিক পাকিস্তান	২য়	২৮১
১২.	১৪ জানুয়ারি ১৯৬৯	চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিরোধ কমিটির প্রচারপত্র। প্রতিবাদে যারা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে ছিলেন, সুফিয়া কামাল।	লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ	২য়	৪০৩
১৩.	২৩ মার্চ ১৯৭০	অসহযোগ আন্দোলনের বজ্র শপথ বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসরে কবিতা পাঠ করেন মেহেরুন নেসা।	দৈনিক পাকিস্তান	২য়	৭৭৮
১৪.	২ মার্চ ১৯৭১	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়। এ উপলক্ষে বিকেল সাড়ে ৩টায় বায়তুল মোকাররমের জনসমাবেশে বক্তব্য দেন মিসেস আমেনা বেগম।	দৈনিক পাকিস্তান	২য়	৮২৫
১৫.	১৭ মার্চ ১৯৭১	ঢাকায় বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অসহযোগ আন্দোলনকালীন কর্মসূচি : আজ বিকেলে ১০/সি সেগুন বাগানে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়।			
১৬.	১৮ মার্চ ১৯৭১	আজ সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।	আজাদ	২য়	৮৩২
১৭.	১৫ মার্চ ১৯৭১	পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় ১২ নম্বর তোপখানায় মহিলাদের সাধারণ সভা হয়।	দৈনিক পাকিস্তান	২য়	৮৩০
১৮.	২৫ মে ১৯৭১	নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি দলের প্রতিনিধি হিসেবে যান আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদিকা ও জাতীয় পরিষদ সদস্যা বেগম সরোয়ার মোর্শেদ।	জয় বাংলা ২ জুন ১৯৭১	৩য়	৪৮

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
১৯.	১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	বাংলাদেশ তহবিলের সাহায্যার্থে চ্যারিটি শোতে দেখানো হয় সূর্যস্নান। এতে অভিনয় করেছেন নাসিমা খান, আনোয়ারা, রওশন আরা প্রমুখ।	বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি ইন গ্রেট ব্রিটেনের প্রচারপত্রে	৪র্থ	১২৫
২০.	৩ নভেম্বর ১৯৭১	ব্রিটিশ এসপিজোয়ান হলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অ্যাকশন কমিটির সুরাইয়া খানমের কাছে একটা চিঠি দেওয়া হয়।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি	৪র্থ	১৯৮
২১	১৬ নভেম্বর ১৯৭১	ঈদের কেতরাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য সাহায্যের জন্য বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ব্রিটেনে একটা প্রচারপত্রের মাধ্যমে আবেদন করেন। তাতে কনভেনর ছিলেন মিসেস বক্শ।	ব্রিটেনের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রচারপত্র।	৪র্থ	৭৫৭-৫৮
২২.	২৪ এপ্রিল ১৯৭১	ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন ইউকে'-এর প্রতিষ্ঠাসভায় সভানেত্রী ছিলেন বিলকিস বানু।	কভেন্টেতে অনুষ্ঠিত বাঙালিদের সভার প্রস্তাবাবলি	৪র্থ	৩০
২৩.	৯ জুলাই ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত কথিকামালায় নিউজ উইকের সংবাদদাতা টনি ক্লিফটন-এর একটা রিপোর্ট প্রচার করা হয়। তাতে বলা হয়—লাল ফুল ও সবুজ পাতা আঁকা গোলাপি রঙের একটা ছেঁড়া ফ্রকের আট-ন বছরের বালিকা ইসমত আরার মুখে আমি আতঙ্ক দেখেছি।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	৫ম	৭৩
২৪.	৩ ডিসেম্বর ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানে এহিয়া বধ কাব্য আবৃত্তি করেন উম্মে কুলসুম।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	৫ম	৪২০
২৫.		স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্মকথা নামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়—যেসব শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী অনুষ্ঠান সমৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে আছেন সুমিতা দেবী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, নুরুন্নাহার মযহার, উম্মে কুলসুম, কণ্ঠ শিল্পী কল্যাণী ঘোষ, স্বপ্না রায় প্রমুখ।	জয় বাংলা বিশেষ সংখ্যা ১৯৭২	৫ম	৬৪৪
২৬.	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা কথিকামালা আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহিলা। এতে যাদের নাম উল্লেখ আছে তারা বীরাঙ্গনা খাওলা, চাঁদ সুলতানা, জামীলা বোখারীদ, প্রীতিলতা, লায়লা খালেদ আরা প্রমুখ।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	৫ম	২৫১
২৭.	১৩ আগস্ট ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কথিকা প্রচারিত হয়, যেটা রচনা করেন। জেবুন্নাহার আইভি।	ঐ	৫ম	২৫০

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
২৮.	৪ নভেম্বর ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় মুক্তিসংগ্রামে মায়ের প্রেরণা'-এর রচয়িতা ছিলেন জেবুন্নাহার আইভি।	ঐ	৫ম	২৬৭-৭০
২৯.	৫ নভেম্বর ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'মুক্তি সংগ্রাম ও বঙ্গবীরঙ্গনা'—কথিকাটি নূরজাহান মযহার রচিত।	ঐ	৫ম	২৭০-৭২
৩০.	৮ নভেম্বর ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা. বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কথিকা 'রণাঙ্গনে বাংলার নারী'—রচয়িতা ছিল উম্মে কুলসুম।	শব্দ সৈনিক ফেব্রুয়ারি ১৯৭২	৫ম	৩০১-৩
৩১	১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কথিকা 'দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা'-এর রচয়িতা ছিল বাসনা গুণ।	ঐ	৫ম	৩০৮-১০
৩২.	২২ সেপ্টেম্বর	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কথিকা 'যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী' রচয়িতা মিস ডলি নাথ।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	৫ম	২৫৬-৫৭
৩৩.	৭ ডিসেম্বর ১৯৭১	'দৈনিক আজাদ' এ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব নারীরা প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন তারা হলেন—আনোয়ারা বেগম—বনগাঁ, অঞ্জনা রায়—কলিকাতা, সেলিনা আখতার-সিলেট।	সংবাদপত্র, বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১৫ সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৩৫৪-৫৭
৩৪.	২৮সেপ্টেম্বর ১৯৭১	অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমননীতির শিকার হন ড. নীলিমা ইব্রাহিম।	সংবাদপত্র : বাংলার বাণী ৬ষ্ঠ ৫ম সংখ্যা।	৩০৮	১৯৭১
৩৫.	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	নয়াদিল্লিতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্মেলনে যেসব বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অবদান ছিল তাদের মধ্যে ছিলেন অসরোল মিসেস মিগরিড, সুচেতা কৃপালনী, বিজয় লক্ষী পণ্ডিত প্রমুখ।	সংবাদপত্র জয়বাংলা ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৮৬-৮৮
৩৬.	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	বিভিন্ন বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে মিস সুরাইয়া খানম ছিলেন।	সংবাদপত্র বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, ২৫তম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৭৩৫
৩৭.	২৬ অক্টোবর	কনজারভেটিভ কনফারেন্সে ডেলিগেট হিসেবে মিস সুরাইয়া খানম ছিলেন।	ঐ ৩৬ তম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৭৩৫
৩৮.	১২ জুলাই	স্বাধীন বাংলা (সোনার দেশ) সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন মিসেস জাহানারা কামরুজ্জামান।	১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	১৬৭
৩৯.	১২ অক্টোবর ১৯৭১	'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে' লন্ডনে শ্রমিক দলের এই সম্মেলনে বিবৃতি দেন শ্রমিক দলের সাবেক মন্ত্রী মিসেস জুডিথ হার্ট। বোম্বাইয়ের রান্দ্রা সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের ছাত্রী ইয়ং ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্ট গ্রুপের সভানেত্রী কুমারী নোরেনা।			

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
৪০.	২১ নভেম্বর ১৯৭১	'মুক্ত সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি' শিরোনামে মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস বদরুন পাশার বিবৃতি প্রকাশ হয়।	সংবাদপত্র জনমত ৩য় পর্ব ৪০তম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৭৪৫
৪১.	৪ অক্টোবর ১৯৭২	বাংলাদেশে নারীদের ওপর পাক ফৌজের অত্যাচার তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য রাষ্ট্র সংঘের প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আবেদন।	সংবাদপত্র বাংলাদেশ ১ম পর্ব ১৫ সংখ্যা।	৬ষ্ঠ	১৪৩
৪২.	১ নভেম্বর ১৯৭১	পাকিস্তানি সেনা—নারী নির্যাতন ও আলেম সমাজ নামে সম্পাদকীয় ছাপা হয়।	সংবাদপত্র : মুক্তবাংলা ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৪০৪
৪৩.	১২ জুলাই ১৯৭১	বিশ্বের নারীসমাজের প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অন্তিম আবেদন 'বাংলার নারীদের বাঁচান।'	সংবাদপত্র : স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	১৬৯
৪৪.	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	স্বাধীনতার জন্য নারীরা	দি নেশন : ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা	৬ষ্ঠ	৬৫০
৪৫.	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	সাধারণ পরিষদে পাক প্রতিনিধি দলের নাম ঘোষণা করা হয়। তাতে ছিলেন ড. বেগম ইনায়েত উল্লাহ পিএইচডি. মিসেস রাজিয়া ফয়েজ. ড. ফাতিমা সাদিক।	দৈনিক পাকিস্তান	৭ম	১৩২
৪৬.	৫ আগস্ট	আওয়ামী লীগের নির্বাচন অভিযানের বিরুদ্ধে যারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানান তাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস আমেনা বেগম, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের উর্ধ্বতন সহসভানেত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী।			
৪৭.	১৯৭২-৭৪	গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ যারা দিয়েছেন তারা হলেন—বাসন্তী রানী গুহঠাকুরতা শিক্ষয়িত্রী, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-৪ মিসেস রাবেয়া খাতুন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা :	বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র	৮ম	১৩
		মিসেস আবু তালেব, ঘোড়াশাল			
		দেলজান বিবি, রাজশাহী			১০৬
		সোনাভান খাতুন, রাজশাহী			১৮৭
		হাসিনা বেগম, পাবনা			১৯২
		মনোয়ারা খাতুন, [illegible]			১৯৪
		সাবিত্রী দেবী [illegible]			১৯৬
		শ্রীমতি পদ্মমণি.			১৯৮
		মোছা, এসবাহাতুন, পাবনা			১৯৯
		মোছা. রহিমা খাতুন, পাবনা			২২৫
		নীলিমা রানী নাথ, খুলনা			২৩৬
		রেবা রানী নাথ, খুলনা			২৪০
		তাহমীনা বেগম দিপালী, খুলনা			২৫৩
		নূরজাহান, যশোর			২৯৪
		ভারতী দেবী চক্রবর্তী, বরিশাল			৩০৪

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
		খাদিজা বেগম দুলু, বরিশাল			৩০৫
		রেনুবালা বারুই, বরিশাল			৩০৭
		ভারতী রানী বসু, বরিশাল			৩১০
		উষা রানী মল্লিক, বরিশাল			৩১৮
		সুধা রানী বসু, বরিশাল			৩২৪
		সন্তষী বালা ঢালী, বরিশাল			৩৫৮
		আফিজা খাতুন, নোয়াখালী			৩৫৮
		নূরজাহান বেগম. নোয়াখালী			৩৭৬
		গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ			৩৮০
		মোছা. পিয়ারা খাতুন, নোয়াখালী			৩৮৫
		আলেয়া বেগম, নোয়াখালী			
		মোছাঃ চাঁনভানু, নোয়াখালী			৩৯৮
৪৮.	২ জানুয়ারি ১৯৭১	চট্টগ্রাম শহর শত্রুকবলিত হলে বেগম খালেদা জিয়া বোরখার আবরণে আত্মোগোপন করেন।			৪৭৬
৪৯.	১৯ জানুয়ারি	কান্নায় কণ্ঠ রোধ হয়ে এলে মিসেস আহমদের : জল্লাদের স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না।			৪৭৩
৫০.	৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১	বরিশালের ভাগীরথীর ওপর নির্যাতন			৪৮১
৫১.	৯ ফেব্রুয়ারি	হাসিনা আশরাফের প্রতিবেদন			৪৮৩
৫২.	২২মে ১৯৭২	রাজশাহীতে ৫৫ জন মহিলার ওপর নির্যাতন চালায়			৫৮৭
৫৩.	২৪ জানুয়ারি	ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল ডা. আয়শাকে			৬১৮
৫৪.	৪ জানুয়ারি ১৯৭১	বেগম মুজিবের বিষাদঘন দিনগুলোর কয়েকটি কথা			৬৩৫
৫৫.	১৯৭১	বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশারফের বিবৃতি ক্যাপ্টেন আখতারের নেতৃত্বে যাদের নিয়ে হাসপাতাল গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামালের দুমেয়ে টুলু এবং লুলু, মেডিকেল ছাত্রী ডালিয়া, আসমা, রেশমা ক্যাপ্টেন সিতারা সবিতা প্রমুখ।	সাক্ষাৎকার : বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশারফ ১৯৭৪-৭৫	৯ম	১৫৭
৫৭.	২৩ মার্চ ১৯৭১	যশোর রণাঙ্গনে : কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীদের নারী বাহিনী গড়ে ওঠে	'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থ।	৯ম	৩৮১
৫৮.	১৯৭১	লে. কর্নেল আবু তাহের সালাহউদ্দিনের বিবৃতিতে আছে রেসকোর্সের মাঝখানে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরের নারীদের হত্যা করা হয়।	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	৯ম	১০
৫৯.	৮ এপ্রিল ১৯৭১	বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত হয় এতে অনেকের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতি রমা চৌধুরী	দৈনিক আনন্দ বাজার	১২	২৮৩

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
৬০.	২৫ এপ্রিল ১৯৭১	বোম্বেতে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত হয়। এতে যারা ছিলেন— বেগম মহবুব নসরুল্লা, ওয়াহিদা রহমান, শ্রীমতি শর্মিলা ঠাকুর, শ্রীমতি মীনা কুমারী।	দৈনিক যুগান্তর	১২	৩৩৩
৬১.	২৮ মার্চ ১৯৭১	বাংলাদেশের শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সমর্থনে কলিকাতা মাঠে কিছু বালক-বালিকা অনশন করে। তাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতি লীলা বসু (৫৯) ও শ্রীমতি টুকুরানী দাস।	দৈনিক যুগান্তর	১২	৩০০
৬২.	১ এপ্রিল ১৯৭১	বাংলাদেশের মুক্তি সমর্থনে ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন হলে ভারতীয় ফেডারেশনের উদ্যোগে মহিলাদের এক সভা হয়।	দৈনিক যুগান্তর	১২	৩১১
৬৩.	৮ এপ্রিল ১৯৭১	সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির বিবৃতিতে যাদের নাম আছে- সরযূ বালা দেবী, সুচিত্রা মিত্র।	দৈনিক যুগান্তর	১২	৩১৬
৬৪.	৮মে ১৯৭১	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যারা প্রস্তাব রাখেন তাদের মধ্যে শ্রীমতি গীতা মুখার্জি ছিলেন।	পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার কার্যবিবরণী	১২	২৫৩
৬৫.	৪ অক্টোবর ১৯৭১	পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত নারী কমিটির বিবৃতি।	প্রাভদা। উদ্ধৃতি বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৩	৫৭২
৬৬.	৯ জুলাই ১৯৭১	রবীন্দ্র-সদনে 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' নামক অনুষ্ঠানে গান গায় শাহীন আখতার। আরো ছিলেন শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্র, সানজিদা খাতুন, ডালিয়া নৌশিন, কল্যাণী ঘোষ অপর্ণা সেন, নীলিমা সেন প্রমুখ।	যুগান্তর	১৪	৮৮১-৮৫২
৬৭.	১৭ জুন ১৯৭১	ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বনগাঁয় সুবৃহৎ সমাবেশে যারা ছিলেন—শ্রীমতি রেনু চক্রবর্তী, বিমলা ফারুকী, মালেকা বেগম, অরুণা আসফ আলী, গীতা মুখার্জি।	কালান্তর	১৪	৮২০-৮২১
৬৮.	১৭ এপ্রিল ১৯৭১	স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলাদেশের পাশে পশ্চিম বাংলা: এতে যারা বিবৃতি দেন ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, মৈত্রেয়ী দেবী, ইলা মিত্র, ড. রমা চৌধুরী, গীতামুখার্জি, অরুণামুন্সি, কমলা মুখার্জি, মায়া দাস, মীরা দত্তগুপ্তা প্রমুখ।	কালান্তর	১৪	৬৯১-৬৯৪
৬৯.	৬ জুন ১৯৭৩	শ্রীমতি কণিকা বিশ্বাস (জাতীয় সংসদ সদস্য, ফরিদপুর, সংরক্ষিত আসন)-এর সাক্ষাৎকার।		১৫	১৯৭-৯৮
৭০.	৩০ জুন ১৯৭৩	মমতাজ বেগমের সাক্ষাৎকার গণপরিষদ সদস্য, সাবেক এমএনএ মহিলা আসন-৬।		১৫	৩২২-২৪
৭১.	৩০ জুন ১৯৮৩	ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলামের বিবৃতিতে মিস অরুন্ধতী রায়ের কথা আছে।	সাক্ষাৎকার	১৫	১৬০

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	সূত্র	খণ্ড নং	পাতা নং
৭২.	৩০ জুন ১৯৭৩	মমতাজ বেগমের বিবৃতিতে মহিলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার কথা বলা হয়েছে।	সাক্ষাৎকার	১৫	৩২৩
৭৩.	জুন ১৯৮৩	ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলামের বিবৃতিতে মিসেস ওসমানের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।		১৫	১০৩
৭৪.	মার্চ ১৯৮৪	ওয়াহিদুল হকের বিবৃতিতে সানজিদা খাতুনের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।		১৫	১৯৫
৭৫.	১৯৮০	সিরাজুর রহমান বিবিসি বাংলা বিভাগের বিবৃতিতে সুরাইয়া খানমের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কথাও বলা হয়েছে।		১৫	৪৩৮
৭৭	৩০ জানুয়ারি ১৯৭১	এম এ মুহিতের বিবৃতিতে বেগম এনায়েত করিমের ভূমিকার উল্লেখ আছে।		১৫	১৭৬
৭৮.	১ জুলাই ১৯৮৪	আব্দুল মালেক উকিলের বিবৃতিতে বানীদাসের ও মিসেস সুভদ্রা ঘোষীর ভূমিকার কথা আছে,		১৫	৬২
৭৯.	জুন ১৯৮৩	ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলামের বিবৃতিতে কোম আমির-উল ইসলামের কথা বলা আছে।		১৫	১৩৮-৪০
৮০.	ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বিবৃতিতে খুশু বিলকিস বানুর কথা বলা হয়েছে।		১৫	৬৮
৮১.	নভেম্বর ১৯৮৪	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর বিবৃতিতে আখতার সোলায়মান বেবীর ও সুফিয়া রহমানের কথা বলা হয়েছে।		১৫	৩৩৭
৮২.	জুলাই ১৯৭১	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে শ্রীমতি মৃন্ময়ী বোসের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমতি সুশীলার কথাও আছে।		১৫	৪৭৭

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ও অবদান যেসব গ্রন্থে পাওয়া যাবে তার একটি নির্বাচিত তালিকা

১. *আমার একাত্তর,* আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১
২. *আমি নারী,* মালেকা বেগম, ইউ পি এল, ঢাকা ২০০০
৩. *একাত্তরের ডায়েরি,* সুফিয়া কামাল, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৬, ঢাকা।
৪. *একাত্তরের দিনগুলো,* জাহানারা ইমাম, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৭
৫. *একাত্তরের স্মৃতি,* বাসন্তী গুহঠাকুরতা, ইউপিএল, ঢাকা ১৯৯১
৬. *একাত্তরের বিজয়গাথা,* মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২
৭. *একাত্তরের ঢাকা,* সেলিনা হোসেন, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
৮. *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ,* সম্পাদক-নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৮৭
৯. *একাত্তরের নয় মাস,* রাবেয়া খাতুন, আগামী প্রকাশনী, ডাকা, ১৯৯১
১০. *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি,* শাহরিয়ার কবির, ঢাকা, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯১
১১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি,* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৭
১২. *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা,* মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০
১৩. *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা,* মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
১৪. *দুর্দিনের দিনলিপি,* আবুল ফজল, মুক্তধারা, ১৯৮২
১৫. *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ,* হারুন হাবিব সম্পাদিত, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯১
১৬. *বাংলার নারী আন্দোলন,* মালেকা বেগম, ইউপিএল ঢাকা, ১৯৮৯।
১৭. *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা,* ফরিদা আকতার সম্পাদিত, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১
১৮. *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী,* মুশতারী শফী, প্রিয়ম প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯২
১৯. *মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম,* মুসা সাদিক, প্রকাশক হাবিবই-আকবর মেহমুদ ও সয়মুন হাবিব মুনাজ, ঢাকা, ১৯৯৫
২০. *মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে,* পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১
২১. *মুক্তিযুদ্ধ পঁচিশ বছর,* সম্পাদনা রহীম শাহ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭
২২. *মুক্তিমঞ্চে নারী,* ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ প্রিপট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯
২৩. *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল্‌স্‌ ও অন্যান্য বাহিনী,* মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯
২৪. *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক,* দীপংকর মোহান্ত, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০
২৫. *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়,* প্রণবকুমার বড়ুয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮
২৬. *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস,* সাহিদা বেগম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৬
২৭. *রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৯
২৮. *রাইফেল রোটি আওরাত,* আনোয়ার পাশা চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭
২৯. *সত্যেন সেন-এর প্রবন্ধ রক্তাক্ত বাংলা,* ঢাকা

৩০. *সম্মুখ সমরে বাঙালি,* রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯
৩১. *স্বাধীনতা সংগ্রাম : ঢাকার গেরিলা অপারেশন,* হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, ১৯৭২
৩২. *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী,* ফোরকান বেগম, ১৯৯৮
৩৩. *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,* ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯
৩৪. *স্বাধীনতা '৭১,* কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৩৫. *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন,* বেগম মুশতারী শফি, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯
৩৬. *স্বাধীনতা '৭১,* কাদের সিদ্দিকী, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২
৩৭. *স্মৃতিময় '৭১, হেনা দাশ,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১
৩৮. *হৃদয়ে একাত্তর,* পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩, '৯৪
৩৯. *সেই সব দিন,* মুনতাসীর মামুন, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭